প্রাক্‌কথন

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক শ্রেণির জন্য যে পাঠক্রম প্রবর্তিত হয়েছে, তার লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল প্রতিটি শিক্ষার্থীকে তাঁর পছন্দমতো কোনও বিষয়ে সাম্মানিক (honours) স্তরে শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ করে দেওয়া। এ-ক্ষেত্রে ব্যক্তিগতভাবে তাঁদের গ্রহণক্ষমতা আগে থেকেই অনুমান করে না নিয়ে নিয়ত মূল্যায়নের মধ্য দিয়ে সেটা স্থির করাই যুক্তিযুক্ত। সেই অনুযায়ী একাধিক বিষয়ে সাম্মানিক মানের পাঠ-উপকরণ রচিত হয়েছে ও হচ্ছে — যার মূল কাঠামো স্থিরীকৃত হয়েছে একটি সুচিন্তিত পাঠক্রমের ভিত্তিতে। কেন্দ্র ও রাজ্যের অগ্রগণ্য বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের পাঠক্রম অনুসরণ করে তার আদর্শ উপকরণগুলির সমন্বয়ে রচিত হয়েছে এই পাঠক্রম। সেইসঙ্গে যুক্ত হয়েছে অধ্যেতব্য বিষয়ে নতুন তথ্য, মনন ও বিশ্লেষণের সমাবেশ।

দূর-সঞ্চারী শিক্ষাদানের স্বীকৃত পদ্ধতি অনুসরণ করেই এই সব পাঠ-উপকরণ লেখার কাজ চলছে। বিভিন্ন বিষয়ের অভিজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলীর সাহায্য এ কাজে অপরিহার্য এবং যাঁদের নিরলস পরিশ্রমে লেখা, সম্পাদনা তথা বিন্যাসকর্ম সুসম্পন্ন হচ্ছে তাঁরা সকলেই ধন্যবাদের পাত্র। আসলে, এঁরা সকলেই অলক্ষ্যে থেকে দূর-সঞ্চারী শিক্ষাদানের কার্যক্রমে অংশ নিচ্ছেন ; যখনই কোনো শিক্ষার্থী এই পাঠ্যবস্তুনিচয়ের সাহায্য নেবেন, তখনই তিনি কার্যত একাধিক শিক্ষকমণ্ডলীর পরোক্ষ অধ্যাপনার তাবৎ সুবিধা পেয়ে যাচ্ছেন।

এইসব পাঠ-উপকরণের চর্চা ও অনুশীলনে যতটা মনোনিবেশ করবেন কোনও শিক্ষার্থী, বিষয়ের গভীরে যাওয়া তাঁর পক্ষে ততই সহজ হবে। বিষয়বস্তু যাতে নিজের চেষ্টায় অধিগত হয়, পাঠ-উপকরণের ভাষা ও উপস্থাপনা তার উপযোগী করার দিকে সর্বস্তরে নজর রাখা হয়েছে। এরপর যেখানে যতটুকু অস্পষ্টতা দেখা দেবে, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পাঠকেন্দ্রে নিযুক্ত শিক্ষা-সহায়কগণের পরামর্শে তার নিরসন অবশ্যই হতে পারবে। তার ওপর প্রতি পর্যায়ের শেষে প্রদত্ত অনুশীলনী ও অতিরিক্ত জ্ঞান অর্জনের জন্য গ্রন্থ-নির্দেশ শিক্ষার্থীর গ্রহণ-ক্ষমতা ও চিন্তাশীলতা বৃদ্ধির সহায়ক হবে।

এই অভিনব আয়োজনের বেশ কিছু প্রয়াসই এখনও পরীক্ষামূলক—অনেক ক্ষেত্রে একেবারে প্রথম পদক্ষেপ। স্বভাবতই ত্রুটি-বিচ্যুতি কিছু কিছু থাকতে পারে, যা অবশ্যই সংশোধন ও পরিমার্জনার অপেক্ষা রাখে। সাধারণভাবে আশা করা যায়, ব্যাপকতর ব্যবহারের মধ্য দিয়ে পাঠ-উপকরণগুলি সর্বত্র সমাদৃত হবে।

অধ্যাপক (ড.) শুভ শঙ্কর সরকার
উপাচার্য

১৬ তম পুনর্মুদ্রণ : জুন, 2019

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের দূরশিক্ষা ব্যুরোর বিধি অনুযায়ী মুদ্রিত।
Printed in accordance with the regulations of the Distance Education
Bureau of the University Grants Commission.

পরিচিতি

বিষয় ঃ প্রয়োগ অভিমুখী (গার্হস্থ্য রসায়ন)

পাঠক্রম ঃ পর্যায় ঃ AOC 03 : 01

	রচনা	সম্পাদনা
একক 1	❑ শ্রী সত্যব্রত চৌধুরী	ড. মুকুল চন্দ্র দাস
একক 2	❑ শ্রী সঞ্জীব কুমার দাস	ড. মুকুল চন্দ্র দাস
একক 3	❑ ঐ	ড. মনোতোষ দাশগুপ্ত
একক 4	❑ ড. পার্থ সারথি ঘোষ	ড. মুকুল চন্দ্র দাস

পাঠক্রম ঃ পর্যায় ঃ AOC 03 : 02

	রচনা	সম্পাদনা
একক 5	❑ ড. পার্থ সারথি ঘোষ	ড. মুকুল চন্দ্র দাস
একক 6	❑ ড. মুকুল চন্দ্র দাস	অধ্যাপক অশোক চৌধুরী
একক 7	❑ ঐ	ড. মনোতোষ দাশগুপ্ত
একক 8	❑ শ্রী সত্যব্রত চৌধুরী	ড. মুকুল চন্দ্র দাস

প্রজ্ঞাপন

এই পাঠ-সংকলনের সমুদয় স্বত্ব নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা সংরক্ষিত। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমতি ছাড়া এর কোনোও অংশের পুনর্মুদ্রণ বা কোনোভাবে উদ্ধৃতি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

মোহন কুমার চট্টোপাধ্যায়
নিবন্ধক

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

AOC 03

প্রয়োগ অভিমুখী পাঠক্রম

(গার্হস্থ্য রসায়ন)

পর্যায়

1

একক 1	❑ জ্বালানি	7 – 23
একক 2	❑ জলদূষণ	24 – 38
একক 3	❑ বায়ুদূষণ	39 – 60
একক 4	❑ প্রসাধন সামগ্রী এবং রঞ্জক পদার্থ	61 – 75

পর্যায়

2

একক 5	❑ সাবান, পরিষ্কারক ও জল	79 – 98
একক 6	❑ ওষুধ ও জীবাণুনাশকের রসায়ন	99 – 118
একক 7	❑ চর্বি ও তেল	119 – 139
একক 8	❑ রংশিল্প ও বার্ণিশ	140 – 153

একক 1 ❑ জ্বালানী (Fuels)

গঠন

1.0 প্রস্তাবনা

উদ্দেশ্য

1.1 জ্বালানীর শ্রেণীবিভাগ

1.2 তাপন মূল্য

1.3 কঠিন জ্বালানী

1.3.1 কয়লা—উৎপত্তি ও রাসায়নিক প্রকৃতি

1.3.2 কয়লার শ্রেণীবিভাগ

1.3.3 চূর্ণীকৃত কয়লা

1.3.4 কয়লার অঙ্গারীকরণ

1.4 তরল জ্বালানী

1.4.1 পেট্রোলিয়াম

1.4.2 কঠিন জ্বালানী অপেক্ষা তরল জ্বালানী ব্যবহারের সুবিধা

1.5 গ্যাসীয় জ্বালানী

1.5.1 প্রোডিউসার গ্যাস

1.5.2 ওয়াটার গ্যাস

1.6 শক্তির বিকল্প উৎস

1.6.1 জৈব গ্যাস

1.6.2 এল্.পি.জি. বা তরলীকৃত খনিজ তেল

1.6.3 গোবর গ্যাস

1.6.4 বায়ুশক্তি

1.6.5 সৌরশক্তি

1.6.5.1 সৌরজল উত্তাপক

1.6.5.2 সৌরপাচক

1.7 সারাংশ

1.8 সর্বশেষ প্রশ্নাবলি

1.9 উত্তরমালা

1.0 প্রস্তাবনা

সভ্যতার প্রথম সোপান হল মানুষের আগুন জ্বালাতে শেখা। প্রস্তর যুগের (stone age) মানুষ কিভাবে প্রথম আগুন জ্বালতে শিখল তা অবশ্য বিজ্ঞানের ইতিহাস থেকে জানা যায় না। আদিম যুগের মানুষ তিন ভাবে আগুনকে ব্যবহার করত; জল গরম করা, মাংস ঝলসান ও বন্য জীবজন্তুকে ভয় দেখান।

এই আগুন মানুষকে প্রথমে দেয় অন্ধকারে আলো। সেই আলোই হয়ে ওঠে জ্ঞানের আলো। এই আগুন হল শক্তির প্রতীক এবং এর উৎস হল জ্বালানী। যে সমস্ত পদার্থ বাতাসের অক্সিজেনের সম্পূর্ণ দহনের ফলে প্রচুর তাপ ও আলো দেয়, যা গৃহস্থালী ও শিল্প উভয়ক্ষেত্রে ব্যবহার করা যায় তাদেরকে জ্বালানী বলে। সাধারণতঃ এই সমস্ত পদার্থে কার্বন প্রধান উপাদান হিসাবে থাকে। যেমন—কাঠ, কয়লা, পেট্রোল, কেরোসিন, কোল গ্যাস, গোবর গ্যাস ও প্রাকৃতিক গ্যাস প্রভৃতি জ্বালানীর উদাহরণ। নিউক্লিয় শক্তিও জ্বালানী হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

উদ্দেশ্য :

এই এককটি পাঠ করে জ্বালানী সম্ভবন্ধে আপনার স্বচ্ছ ধারণা জন্মাবে। আপনি জানতে পারবেন—

- জ্বালানী তিন প্রকার যেমন—কঠিন, তরল ও গ্যাসীয়
- তাপন মূল্যের সংজ্ঞা এবং বিভিন্ন পদ্ধতিতে তাপন মূল্যের একক
- কঠিন জ্বালানী কয়লার শ্রেণীবিভাগ ও অঙ্গারীকরণ প্রক্রিয়া
- তরল জ্বালানী প্রাকৃতিক পেট্রোলিয়াম কিভাবে শোধন করা হয় এবং বিভিন্ন তাপমাত্রায় প্রাপ্ত পাতিত অংশের ব্যবহার

- প্রডিউসার গ্যাস হল কার্বন মনোক্সাইড (CO) ও নাইট্রোজেনের (N_2) মিশ্রণ এবং ওয়াটার গ্যাস হল কার্বন মনোক্সাইড ও হাইড্রোজেনের (H_2) মিশ্রণ। কঠিন জ্বালানী উত্তপ্ত কোকের সঙ্গে বায়ুর বিক্রিয়ায় প্রডিউসার গ্যাস এবং উত্তপ্ত কোকের সঙ্গে জলীয় বাষ্পের বিক্রিয়ায় ওয়াটার গ্যাস প্রস্তুত করা হয়
- তরল জ্বালানী ব্যবহারের সুবিধা
- অচিরাচরিত শক্তির উৎস যেমন—সৌরশক্তি, বায়ুশক্তি, গোবর গ্যাস ইত্যাদি
- সৌরশক্তির ব্যবহারিক প্রয়োগ যেমন—সৌর জল উত্তাপক ও সৌরপাচক

1.1 জ্বালানীর শ্রেণীবিভাগ

জ্বালানী প্রধানতঃ দুই ভাগে বিভক্ত। প্রাইমারী বা প্রাকৃতিক জ্বালানী ও সেকেন্ডারী বা কৃত্রিম জ্বালানী। যে সমস্ত জ্বালানী প্রকৃতিতে সরাসরি পাওয়া যায় তাদের প্রাকৃতিক ও যে সমস্ত জ্বালানী প্রাকৃতিক জ্বালানী থেকে প্রস্তুত করে নেওয়া হয় তাদের কৃত্রিম জ্বালানী বলে। ভৌত অবস্থা অনুসারে এদের প্রত্যেককে আবার তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করা যায় যেমন—কঠিন, তরল ও গ্যাসীয়। নিম্নে উদাহরণ সহকারে জ্বালানীর শ্রেণীবিভাগ দেওয়া হল।

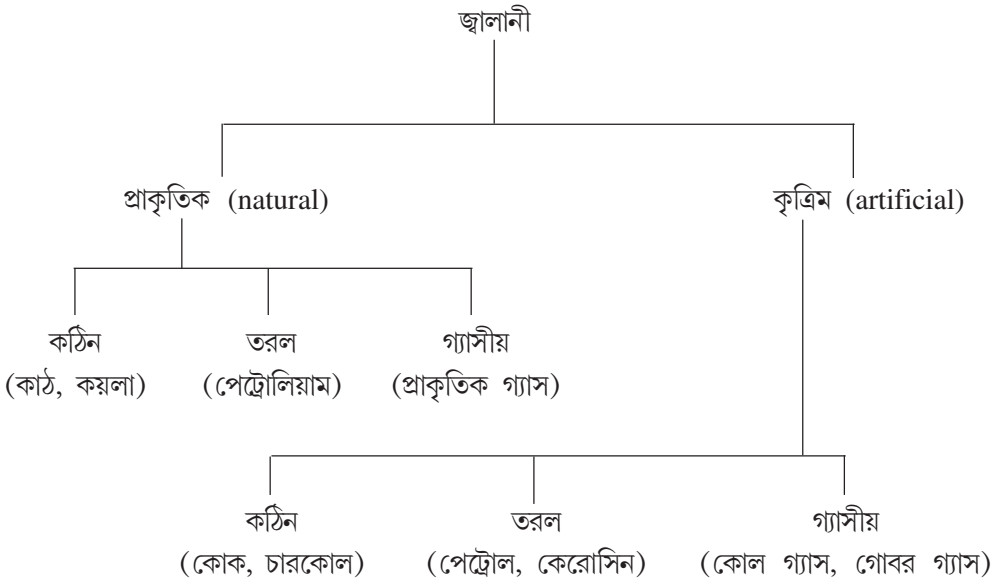

1.2 তাপন মূল্য

জ্বালানীর উৎকর্ষতাকে তাপন মূল্য দ্বারা পরিমাপ করা হয়।

কঠিন ও তরল জ্বালানীর ক্ষেত্রে একক ভর এবং গ্যাসীয় জ্বালানীর ক্ষেত্রে একক আয়তন কোন জ্বালানীর বাতাসের অক্সিজেনে সম্পূর্ণ দহনের ফলে যে তাপ উৎপন্ন হয় তাকে ওই জ্বালানীর তাপন মূল্য বলে।

তাপন মূল্যের এককগুলি হল :

(a) কঠিন ও তরল জ্বালানীর ক্ষেত্রে :

ক্যালরি / গ্রাম, কিলো ক্যালরি / কি.গ্রা. এবং বি. টিএইচ. ইউ. / পাউন্ড (B.Th.U./ 1b) এরা যথাক্রমে 1 গ্রাম বা 1 কি.গ্রা. বা 1 পাউন্ড জ্বালানীর সম্পূর্ণ দহনের ফলে যত ক্যালরি বা কিলো ক্যালরি বা ব্রিটিশ থার্মাল একক তাপ উৎপন্ন হয় সেগুলোকে বোঝায়।

(b) গ্যাসীয় জ্বালানীর তাপন মূল্যের একক :

কিলো ক্যালরি / ঘন মিটার বা বি. টিএইচ. ইউ. / ঘন ফুট। এরা যথাক্রমে 1 ঘন মিটার বা 1 ঘন ফুট জ্বালানীর সম্পূর্ণ দহনের ফলে যত কিলো ক্যালরি বা ব্রিটিশ থার্মাল একক তাপ উৎপন্ন হয় সেগুলোকে বোঝায়। [1B.Th.U. = এক পাউণ্ড জলকে 1 উষ্ণতা বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনীয় তাপ। এটি তাপের F.P.S. একক। ক্যালরি হল তাপের C.G.S. একক।]

1.3 কঠিন জ্বালানী

প্রাকৃতিক কঠিন জ্বালানী বিভিন্ন ধরণের হতে পারে, যেমন—কাঠ, কয়লা ইত্যাদি। এছাড়া গাছের শুকনো পাতা, আখের ছিবড়েও (চিনির কারখানা থেকে পাওয়া যায়) জ্বালানী হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এখানে কয়লা সম্ভবন্ধে আমরা আলোচনা করব।

1.3.1 কয়লা—উৎপত্তি ও রাসায়নিক প্রকৃতি

উৎপত্তি : কোটি কোটি বছর পূর্বে ফার্ণ, বড় গাছ, গুল্ম জাতীয় উদ্ভিদ জন্মাত ও মৃত্যুর পর জলাভূমির তলদেশে বিভিন্ন স্তরে জমে থাকত, বাতাস বা অক্সিজেন নির্ভরশীল ব্যাকটেরিয়া

দ্বারা গাছের পচনের ফলে কার্বন ডাইঅক্সাইড, মিথেন এবং অন্যান্য গ্যাসীয় হাইড্রোকার্বন যৌগে পরিবর্তিত হয়, যতক্ষণ বাতাসের সংস্পর্শে গাছপালা থাকে। তার ওপর মাটি, বালি ঢাকা পড়ার পর বাতাসের সংযোগ না থাকায় ব্যাকটেরিয়ার কাজ বন্ধ হত। এভাবে বহু বছর থাকার ফলে আংশিক বিযোজিত কাঠ, যা সিক্ত, খুব শক্ত নয়, এমন পদার্থে পরিবর্তিত হল—যাকে পিট (peat) বলে। একটি স্তরের উপর আরেকটি গাছের স্তর, মাটির স্তর ইত্যাদি পর্যায়ক্রমে থাকার ফলে আরো অনেক বছর পরে পিট আরো শক্ত, কালো পদার্থে পরিণত হয়, যাকে কয়লা বলে।

কয়লা কঠিন জ্বালানীর অন্যতম। বিশ্বব্যাপী বর্তমানে প্রতি বছরে 4×10^9 টন কয়লা খরচ হয়। তার মধ্যে শুধু ইউ.এস.এ. খরচ করে বছরে 7×10^8 টন।

রাসায়নিক প্রকৃতি : কয়লা অনিয়তাকার মৌল কার্বন, বিভিন্ন পরিমাণ হাইড্রোকার্বন, জটিল জৈব যৌগ এবং অজৈব যৌগ সমন্বিত প্রাকৃতিক দাহ্য পদার্থ।

1.3.2 কয়লার শ্রেণীবিভাগ

রাসায়নিক বিশ্লেষণ ও তাপন মূল্যের (calorific value) ওপর ভিত্তি করে কয়লার মান নির্ধারণ করে বিভিন্ন ধাপকে চিহ্নিত করা হয়। নিম্নমান থেকে উচ্চমানের শ্রেণীবিভাগ নিম্নরূপ :

(i) পিট কয়লা

(ii) লিগনাইট কয়লা

(iii) বিটুমিনাস কয়লা

(iv) অ্যানথ্রাসাইট কয়লা

(i) **পিট কয়লা** : এতে জলীয় বাষ্পের পরিমাণ = 80–90% এর উপাদানগুলির ওজন অনুপাত (শুষ্ক অবস্থায়) : কার্বন (C) = 57%, হাইড্রোজেন (H) = 5.7%, নাইট্রোজেন (N) = 2%, অক্সিজেন (O) = 35.3% এর তাপন মূল্য = 5400 কিলো ক্যালরি/কি.গ্রা.।

ভারতবর্ষে এটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ জ্বালানী নয়, ইংল্যান্ড, ইউ. এস. এ. এবং রাশিয়া যেখানে সাধারণ কয়লা পর্যাপ্ত পরিমাণে পাওয়া যায় না, সেখানে পিট সাধারণ কাজে ব্যবহৃত জ্বালানী এবং বিদ্যুৎ তৈরীর কাজে জ্বালানী হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

(ii) **লিগনাইট কয়লা** : এতে 20–60% জলীয় বাষ্প থাকে। শুষ্ক অবস্থায় এর উপাদানগুলির ওজন অনুপাত : কার্বন (C) = 67%, হাইড্রোজেন (H) = 5%, নাইট্রোজেন (N) = 1.5% ও অক্সিজেন (O) = 26.5% এর তাপন মূল্য = 6500–7100 কিলো ক্যালরি/কি.গ্রা.।

এটি গৃহস্থালীর জ্বালানী এবং শিল্পক্ষেত্রে বয়লারে স্টীম উৎপাদনে ও প্রোডিউসার গ্যাসের শিল্পোৎপাদনে জ্বালানী হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

(iii) **বিটুমিনাস কয়লা** : এর তিনটি বিভাগ।

(a) সাব-বিটুমিনাস কয়লা :

এতে জলীয় বাষ্প ও উদ্বায়ী পদার্থের পরিমাণ খুব বেশী। শুষ্ক অবস্থায় উপাদানগুলির ওজন অনুপাত : কার্বন (C) = 77%, হাইড্রোজেন (H) = 5%, নাইট্রোজেন (N) = 1.8% ও অক্সিজেন (O) = 16.2% এর তাপন মূল্য = 7000 কিলো ক্যালরি/কি.গ্রা.। এটি জ্বালানী হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

(b) বিটুমিনাস কয়লা :

এতে উদ্বায়ী পদার্থের পরিমাণ = 20–45%। শুষ্ক অবস্থায় উপাদানগুলির ওজন অনুপাত : কার্বন (C) = 83%, হাইড্রোজেন (H) = 5%, নাইট্রোজেন (N) = 2% ও অক্সিজেন (O) = 10% এর তাপন মূল্য = 8000–8500 কিলো ক্যালরি/কি.গ্রা.। এটি ধাতু নিষ্কাশনে ব্যবহৃত কোক তৈরীতে, কোল গ্যাসের শিল্পোৎপাদনে এবং গৃহস্থালীতে জ্বালানী হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

(c) সেমি-বিটুমিনাস কয়লা :

এতে পদার্থের পরিমাণ কম। শুষ্ক অবস্থায় এর উপাদানগুলির ওজন অনুপাত : কার্বন (C) = 90%, হাইড্রোজেন (H) = 4.5%, নাইট্রোজেন (N) = 1.5% ও অক্সিজেন (O) = 4% এর তাপন মূল্য = 8500–8600 কিলো ক্যালরি/কি.গ্রা.। এটি কোকের শিল্পোৎপাদনে ব্যবহৃত হয়।

(iv) **অ্যানথ্রাসাইট কয়লা** : এটি সমস্ত প্রকার কয়লার মধ্যে কঠিনতম। উদ্বায়ী পদার্থ 8% থেকে কম। শুষ্ক অবস্থায় এর উপাদানগুলির ওজন অনুপাত : কার্বন (C) = 93.3%, হাইড্রোজেন (H) = 3%, নাইট্রোজেন (N) = 0.7% ও অক্সিজেন (O) = 3% এর তাপন মূল্য = 8650–8700 কিলো ক্যালরি/কি.গ্রা.। এটি গৃহস্থালীতে, বয়লারে স্টীম উৎপাদনে এবং ধাতু নিষ্কাশনে জ্বালানী হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

1.3.3 চূর্ণীকৃত কয়লা

অক্সিজেনের সঙ্গে সার্বিক সংস্পর্শের অভাবে কয়লা তথা যে কোন কঠিন জ্বালানীর দহনের গতি কম হয়। দহনের গতি বাড়ানোর জন্য কয়লাকে সূক্ষ্ম গুঁড়োয় পরিণত করা হয়, সূক্ষ্ম গুঁড়োয় পরিণত করলে কয়লার মুক্ত তলের পরিমাণ বেড়ে যায়, কয়লার গুঁড়ো সহজেই বাতাসের সংস্পর্শে

আসে, কয়লাতে উপস্থিত উদ্বায়ী পদার্থগুলি দ্রুত নির্গত হয় এবং স্থিরীকৃত (fixed) কার্বনের দহন দ্রুত হয়। এই সূক্ষ্ম গুঁড়োয় পরিণত কয়লাকে চূর্ণীকৃত (pulverised) কয়লা বলে।

কয়লা চূর্ণীকরণের সুবিধাগুলি হল :

(a) একে সহজেই স্ক্রু কনভেয়র বা বাতাসের প্রবাহের সাহায্যে এক স্থান থেকে অন্য স্থানে স্থানান্তরিত করা যায়।

(b) কয়লা গুঁড়োর পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করে দহনের গতি নিয়ন্ত্রিত করা যায়।

(c) চূর্ণীকৃত কয়লার দহন প্রয়োজন অনুযায়ী শুরু বা বন্ধ করা যায়।

(d) উচ্চ ছাইযুক্ত নিম্নমানের কয়লাও সুবিধাজনকভাবে ব্যবহার করা যায়।

(e) উচ্চ উষ্ণতার সৃষ্টি হয়।

কয়লা চূর্ণীকরণে অসুবিধা :

(a) চূর্ণীকরণের জন্য অতিরিক্ত খরচ হয়।

(b) চূর্ণীকৃত কয়লার দহনের ফলে যে ছাই তৈরী হয় তা খুবই সূক্ষ্ম গুঁড়োর আকারের হয় এবং এর অধিকাংশই নির্গত গ্যাসের সঙ্গে চারদিকে ছড়িয়ে পড়ে, ফলে পারিপার্শ্বিক অঞ্চল নোংরা ও দূষিত হয়।

1.3.4 কয়লার অঙ্গারীকরণ (Carbonisation of Coal)

বাতাসের অনুপস্থিতিতে বিচূর্ণ কয়লাকে, আবদ্ধ পাত্রে উত্তপ্ত করার ফলে তার অন্তর্ধূম পাতন (destructive distillation) হয় অর্থাৎ উদ্বায়ী ও অনুদ্বায়ী অংশে বিভক্ত হয়—এই পদ্ধতিকে অঙ্গারীকরণ বলে। উচ্চ তাপমাত্রায় (1200–1400°C) বা নিম্ন তাপমাত্রায় (600–650°C) অঙ্গারীকরণ ঘটানো যায়, যার ফলে অনুদ্বায়ী পদার্থ হিসাবে কোক এবং উদ্বায়ী অংশ হিসাবে কোল গ্যাস, আলকাতরা, অ্যামোনিয়াযুক্ত জলীয় দ্রবণ উৎপন্ন হয়।

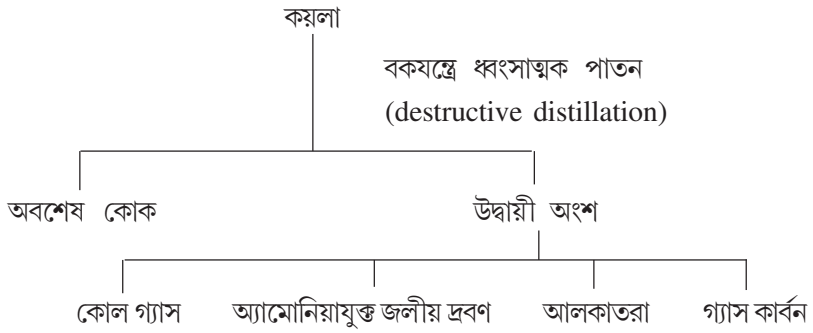

কোকের ব্যবহার : এটি বাড়ীতে জ্বালানী হিসাবে এবং শিল্পে ধাতু নিষ্কাশনে ব্যবহৃত হয়।

অ্যামোনিয়াযুক্ত জলীয় দ্রবণের ব্যবহার : এটি অ্যামোনিয়া প্রস্তুতিতে বা অ্যামোনিয়াম সালফেট $[(NH_4)_2SO_4]$ নামক সার প্রস্তুতিতে ব্যবহৃত হয়।

আলকাতরার ব্যবহার : আলকাতরায় বিভিন্ন ধরণের প্রয়োজনীয় জৈব যৌগ দ্রবীভূত থাকে। আংশিক পাতনের সাহায্যে আলকাতরা থেকে এদের পৃথক করা হয়। এই জৈব যৌগগুলির মধ্যে থাকে—বেঞ্জিন, টলুইন, জাইলিন, ফেনল, ন্যাপথ্যালিন ইত্যাদি। পাতনের অবশেষ পিচ রাস্তাঘাট মেরামতের জন্য ব্যবহৃত হয়।

গ্যাস কার্বনের ব্যবহার : শিল্পে তড়িৎদ্বার (electrode) নির্মাণে ব্যবহৃত হয়।

কোল গ্যাস :

কোল গ্যাস হাইড্রোজেন, মিথেন, কার্বন মনোক্সাইড, ইথিলিন, অ্যাসিটিলিন, বেঞ্জিন বাষ্প, নাইট্রোজেন, কার্বন ডাইঅক্সাইড, অক্সিজেন ইত্যাদি গ্যাসের মিশ্রণ। ইহা প্রধানতঃ জ্বালানীরূপে ও আলোক উৎপাদকরূপে ব্যবহৃত হয়। কয়লার অন্তর্ধূম পাতন করলে এটি উদ্বায়ী ও অনুদ্বায়ী দুই প্রকারের পদার্থ সৃষ্টি করে। শৈত্য প্রয়োগে উদ্বায়ী পদার্থের এক অংশ তরলরূপে পৃথক হয়। অবশিষ্ট গ্যাসীয় অংশ কোল গ্যাস নামে পরিচিত। কোল গ্যাসের উৎপাদন খনিজ কয়লার প্রকৃতি ও অন্তর্ধূম পাতনের তাপমাত্রার উপর নির্ভরশীল।

প্রধানতঃ কার্বন মনোক্সাইডের উপস্থিতির জন্য কোল গ্যাস বিষাক্ত হয়।

1.4 তরল জ্বালানী

বিভিন্ন ধরনের তরল জ্বালানী ব্যবহৃত হয়। যেমন, অ্যালকোহল (power alcohol) পেট্রোলিয়াম ইত্যাদি। এখানে আমরা পেট্রোলিয়াম সম্ভবন্ধে আলোচনা করব।

1.4.1 পেট্রোলিয়াম

পেট্রোলিয়াম হল অশুদ্ধ খনিজ তেল। প্রাণীজ তেল ও চর্বি দীর্ঘদিন মাটির তলায় চাপা পড়ে থেকে উচ্চ চাপ ও তাপের প্রভাবে নানারূপ রাসায়নিক পরিবর্তনের মাধ্যমে এর সৃষ্টি হয়। এটি গাঢ় সবুজাভ বাদামী বর্ণের উচ্চ সান্দ্রতা বিশিষ্ট (viscous) তরল। এতে বিভিন্ন হাইড্রোকার্বন (কার্বন ও হাইড্রোজেনের সমন্বয়ে গঠিত যৌগ) এবং কিছু পরিমাণে অক্সিজেন, নাইট্রোজেন ও সালফার যুক্ত জৈব যৌগ, যেমন পেট্রোল, কেরোসিন, ডিজেল ইত্যাদি বিভিন্ন উপাদান বর্তমান।

এতে খুব সামান্য পরিমাণে ভ্যানাডিয়াম (V), ক্যালসিয়াম (Ca), নিকেল (Ni), আয়রণ (Fe) ইত্যাদি ধাতুর জৈব ধাতব যৌগও (Organometallic) বর্তমান থাকে। এর গড় শতকরা সংযুতি হল :

C = 79.5–87.1, H = 11.5–14.8, S = 0.1–3.5, N + O = 0.1–0.5

পেট্রোলিয়াম থেকে বিভিন্ন নোংরা অপদ্রব্য ও জল অপসারিত করার পর এর আংশিক পাতন করা হয়। বিভিন্ন উষ্মতা রেঞ্জে আংশিক পাতনে প্রাপ্ত উপাদানগুলির নাম ও ব্যবহার নীচে দেওয়া হল :

উষ্নতা	রেঞ্জ	পাতিত পদার্থ	ব্যবহার
1.	25–30°C	সাইমোজেন গ্যাস	L.P.G. নামে গৃহস্থালী ও শিল্প ক্ষেত্রে জ্বালানী হিসাবে
2.	30–70°C	পেট্রোলিয়াম ইথার	তেল ও চর্বির দ্রাবক হিসাবে
3.	70–120°C	পেট্রোল বা গ্যাসোলিন বা মোটর স্পিরিট	মোটরগাড়ী ও বিমানের জ্বালানী হিসাবে, দ্রাবক ও শুষ্ক ধোলাই কাজে
4.	120–150°C	ন্যাপথা বা সলভেন্ট স্পিরিট	দ্রাবক হিসাবে ও শুষ্ক ধোলাই কাজে
5.	150–300°C	কেরোসিন	জ্বালানী ও আলোকদায়ী পদার্থ হিসাবে
6.	300–350°C	ভারী তেল বা ডিজেল বা গ্যাস তেল	ডিজেল ইঞ্জিনে জ্বালানী হিসাবে
7.	350–400°C	তরল প্যারাফিন বা লুব্রিকেটিং তেল	মেশিনের অংশ বিশেষে প্রযুক্ত পিচ্ছিলকারী তেল হিসাবে
8.	> 400°C	ভেসলিন, গ্রীজ ও কঠিন প্যারাফিন বা মোম	মেশিনের ঘর্ষণ নিবারক পদার্থ হিসাবে, প্রসাধনী দ্রব্য ও ওষুধ তৈরীতে
9.	অবশেষ	পেট্রোলিয়াম পিচ এবং অ্যাসফল্ট	রাস্তা তৈরীতে ও জল নিরোধক পদার্থ হিসাবে ব্যবহৃত হয়

1.4.2 কঠিন জ্বালানী অপেক্ষা তরল জ্বালানী ব্যবহারের সুবিধা

(i) তরল জ্বালানীর তাপন মূল্য অপেক্ষাকৃত বেশী।

(ii) তরল জ্বালানী দহনের সময় কোন ছাই গঠন করে না।

(iii) এর প্রজ্জ্বলন ও নির্বাপণ অনেক সহজ এবং দহন অনেক দ্রুত গতি সম্পন্ন।

(iv) জ্বালানীর প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করে প্রজ্জ্বলিত শিখাকে নিয়ন্ত্রণ করা যায়।

(v) পাইপের মাধ্যমে এর পরিবহণ অনেক সহজ।

(vi) এটি ব্যবহারে পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখা সহজ।

(vii) তরল জ্বালানীর দহনের জন্য অনেক কম পরিমাণ বাতাস প্রয়োজন।

(viii) এটি ব্যবহারে শ্রমিক খরচ অনেক কম হয়।

1.5 গ্যাসীয় জ্বালানী

কয়লার অন্তর্ধূম পাতনের সাহায্যে কোল গ্যাসের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। কোল গ্যাস শিল্পে, পরীক্ষাগারে এবং গৃহস্থালীতে জ্বালানী হিসাবে ব্যবহৃত হয়। আলোক উৎপাদকরূপেও এই গ্যাস ব্যবহার করা হয়।

1.5.1 প্রোডিউসার গ্যাস

শ্বেত-তপ্ত কোকের মধ্যে 1000°C উষ্মতায় পরিমিত পরিমাণে বাতাস চালনা করা হলে তাপ উৎপাদক বিক্রিয়ায় প্রোডিউসার গ্যাস উৎপন্ন হয়।

এর সংযুতি হল (শতকরা হিসাবে)—কার্বন মনোক্সাইড = 20-22, নাইট্রোজেন = 60-65, হাইড্রোজেন = 10-12, মিথেন = 2-3 ও কার্বন ডাইঅক্সাইড = 3-4।

প্রোডিউসার গ্যাসে উৎপন্ন কার্বন মনোক্সাইড ও কার্বন ডাইঅক্সাইডের অনুপাত উষ্নতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধি পায়। এর তাপন মূল্য 150 B.Th.U,/1b (বি.টিএইচ.ইউ./পাউণ্ড)। এটি জ্বালানী হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

1.5.2 ওয়াটার গ্যাস

শ্বেত-তপ্ত (1000°C) কোকের মধ্যে দিয়ে স্টীম পাঠালে, তাপশোষক বিক্রিয়ায়, হাইড্রোজেন ও কার্বন মনোক্সাইডের মিশ্রণ উৎপন্ন হয় যাকে ওয়াটার গ্যাস বলে।

এর সংযুতি হল (শতকরা হিসাবে) : হাইড্রোজেন = 48, কার্বন মনোক্সাইড = 42, নাইট্রোজেন = 6, কার্বন ডাইঅক্সাইড = 3, মিথেন = 1 এর ক্যালরি-মান (তাপন মূল্য) 300 B.Th.U./ 1b (বি.টিএইচ.ইউ/পাউণ্ড)। জ্বালানী হিসাবে, হাইড্রোজেনের উৎস হিসাবে এবং ধাতু শিল্পে বিজারক হিসাবে ওয়াটার গ্যাস ব্যবহৃত হয়।

1.6 শক্তির বিকল্প উৎস

(i) জৈব দাহ্য পদার্থ (Biomass) : কাঠ, আখের ছিবড়ে এই ধরণের জৈব দাহ্য পদার্থ সেই পুরাকাল থেকে গার্হস্থ্য জ্বালানী হিসাবে ব্যবহার হয়ে আসছে। কিছু কিছু শিল্প প্রক্রিয়ায় কাঠ এবং কাঠের বর্জ্য পদার্থ জ্বালানী হিসাবে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু এই জ্বালানীর মূল অসুবিধা হল দহনজনিত দূষণ।

(ii) জ্বালানী কোষ (Fuel Cell) : কোন যন্ত্র অনড় অবস্থায় বিদ্যুৎ সৃষ্টি করলে সেটি শক্তি উৎপাদনের একটি সম্ভভাবনাময় ক্ষেত্র হিসাবে পরিগণিত হবে। জ্বালানী কোষ এরকম একটি যন্ত্র। হাইড্রোজেন, প্রাকৃতিক গ্যাস, মিথানল, প্রোপেন ইত্যাদি শক্তির উৎস হিসাবে ব্যবহার করে এই কোষে বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভভব। কোষের তাত্ত্বিক দক্ষতা 82.9%.

(iii) কঠিন আবর্জনা (Solid Waste) : বর্তমানে বহু শহরে কঠিন আবর্জনা পুড়িয়ে স্টীম এবং বিদ্যুৎ উৎপাদন করছে। অবশ্য এক্ষেত্রে বায়ুদূষণের ওপর সযত্ন দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন।

(iv) সৌরশক্তি (Solar Energy) : দক্ষিণমুখী জানালার দ্বারা সৌরতাপ দক্ষভাবে সংগ্রহ করে কাজে লাগানো যায়। সৌরতাপ দ্বারা বয়লার চালিয়ে বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভভব। দর্পণ ব্যবহার করে বৃহৎ সৌরচুল্লী তৈরী করে তার দ্বারা উচ্চ উয়তা পাওয়া সম্ভভব। সৌরউনান গ্রীষ্ম প্রধান দেশে লাভজনক হলেও পুরোপুরি গ্রহণযোগ্য হয়নি।

1.6.1 জৈব গ্যাস (Bio gas)

দূষিত জল বা দূষিত জল বিশোধনের সময়ে প্রাপ্ত আবর্জনার অবায়বীয় জীর্ণকরণ উদ্ভূত গ্যাসকে জৈব গ্যাস বা বায়োগ্যাস বলা যায়। এটা সম্পূর্ণ জ্বালানী হিসাবে ব্যবহৃত হয়। মূলতঃ

অবায়বীয় জীর্ণকরণ বিক্রিয়ায় CH_4 উৎপন্ন হয় বলে ঘটনাটিকে জৈব মিথেন উৎপাদন নামে অভিহিত করা হয়।

1.6.2 এল. পি. জি. বা তরলীকৃত খনিজ তেল

এর পুরো নাম লিক্যুইফায়েড পেট্রোলিয়াম গ্যাস। এল.পি.জি.-তে এমন কিছু উদ্বায়ী হাইড্রোকার্বন থাকে যে উহারা স্বাভাবিক বায়ুমন্ডলীয় চাপে গ্যাসীয় অবস্থায় থাকে, কিন্তু উপযুক্ত চাপের প্রভাবে উহারা তরলে পরিণত হয়। ইহার প্রধান উপাদানগুলি হল : *n*-বিউটেন, আইসোবিউটেন, বিউটেন ও প্রোপেন।

ইহাকে প্রাকৃতিক গ্যাস থেকে বা ভারী তেলের ভাঙ্গানের সময় উপজাত পদার্থ হিসাবে পাওয়া যায়।

কোন ছিদ্রের মধ্যে দিয়ে ইহার নিঃসরণ (leak) সনাক্ত করার জন্য এবং সেই সঙ্গে প্রয়োজনীয় সতর্কতা অবলম্ভবন করার জন্য ইহার সঙ্গে খুব সামান্য পরিমাণে দুর্গন্ধযুক্ত জৈব সালফাইড (বিটা-মারক্যাপটান) যুক্ত করা হয়।

এই গ্যাস স্বাস্থ্যের পক্ষে বিশেষ ক্ষতিকারক নয়, কারণ ইহাতে কোন কার্বন মনোক্সাইড থাকে না।

ইহা গৃহস্থালীতে ও অন্যান্য কিছু যানবাহনের জ্বালানী হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

1.6.3 গোবর গ্যাস

এই গ্যাসের উপাদানগুলির গড় আয়তনিক সংযুতি হল : মিথেন = 55%, হাইড্রোজেন = 7.4%, কার্বন ডাইঅক্সাইড = 35%, নাইট্রোজেন = 2.6% এবং খুব সামান্য পরিমাণ হাইড্রোজেন সালফাইড।

ইহাকে রান্না করার কাজে জ্বালানী হিসাবে ব্যবহার করা হয়।

যদি শুষ্ক গোবর (ঘুঁটে) কে সরাসরি জ্বালানী হিসাবে ব্যবহার করা হয় তবে আবহাওয়া দূষিত হয় এবং উহার দহনের ফলে উত্তাপও অনেক কম পরিমাণে পাওয়া যায়, কিন্তু গোবর থেকে যদি গ্যাস তৈরী করা যায় তবে উহা থেকে অনেক বেশী পরিমাণে তাপ পাওয়া যায় এবং একই সঙ্গে উপজাত পদার্থ হিসাবে নাইট্রোজেন যুক্ত সার তৈরী হয়।

1.6.4 বায়ুশক্তি

বায়ুশক্তি একটি নবীভবনযোগ্য উৎস। ভারতীয় আবহাওয়া দপ্তরের তথ্য অনুযায়ী সমুদ্রতট ও তৎসংলগ্ন অঞ্চলে দিনে বাতাসের বার্ষিক গড় ঘনত্ব 3 kWh/m^2 অর্থাৎ 3 কিলোওয়াট ঘন্টা

প্রতি বর্গমিটার প্রতিদিন। কোন কোন স্থানে এই গড় 10kWh/m^2/day এবং বছরের 5-7 মাস অন্ততঃ 4 kWh/m^2/day এই শক্তিকে কাজে লাগিয়ে বর্তমানে ভূগর্ভ থেকে জল তোলা হয় এবং টারবাইন ঘুরিয়ে জেনারেটর দ্বারা বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হয়। লাদাখে বায়ুশক্তি থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদন হয়। যে সমস্ত স্থানের বায়ুর গতিশক্তি সন্তোষজনক সেখানে ভারত সরকারের প্রচেষ্টায় অনেক বায়ুকল লাগানো হচ্ছে। আশা করা যায় এই শতাব্দীতে 20% শক্তির ভাণ্ডার পূর্ণ হবে বায়ুশক্তির উৎস থেকে।

প্রাচীনকালে যখন বিদ্যুৎ অধরা ছিল তখন বায়ুশক্তির ব্যবহার ছিল। সমুদ্রে বাণিজ্য ও রণতরীর সঞ্চালন, কাঠ-চেরাই এবং শস্য ভাঙ্গানোর কাজে এই শক্তির ব্যবহার ছিল। বর্তমানে যখন অন্যান্য শক্তি অপ্রতুল হয়ে উঠছে তখন বায়ুকল আবার ব্যবহার হচ্ছে। সুইজারল্যান্ডের তিন শাখা বিশিষ্ট বায়ুকল সেকেণ্ডে 10 মিটার হওয়ার গতিবেগে 5000 ওয়াট পর্যন্ত বিদ্যুৎ উৎপাদন করতে পারে।

আমেরিকায় সাইকেল চাকার টারবাইন বেশী ব্যবহার হয়। বর্তমানে বিশ্বের উন্নত দেশ এবং বিকাশশীল দেশগুলি বায়ুকলের গবেষণায় রত।

ভারতের দক্ষিণে এবং উড়িষ্যায় উইণ্ড ফার্ম আছে এবং প্রায় 600 মেগাওয়াট বিদ্যুৎ এগুলি থেকে উৎপাদন হয়। ভারতে এই শক্তি থেকে 2000 মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপাদন সম্ভভব।

1.6.5 সৌরশক্তি

শক্তির সংকট আসলে সভ্যতার সংকট। তাই সভ্যতা যখন বিপন্ন তখন বিকল্পশক্তি বা অপ্রচলিত শক্তির দিকে আমরা তাকাই। বিকল্পশক্তির ক্ষেত্রে বিশেষ করে আমাদের মত গ্রীষ্মপ্রধান দেশে সূর্যের বিপুল শক্তির ভাণ্ডারের দিকে হাত বাড়াতেই হয়। সূর্যরশ্মির সাহায্যে সরাসরি পৃথিবীতে যে বিপুল আলো ও তাপ আসে তার প্রত্যক্ষ ব্যবহার অনেক ক্ষেত্রেই আমরা দেখতে পাই। পৃথিবীর প্রতি বর্গমিটার স্থানে যে পরিমাণ সৌরশক্তি পাওয়া যায় তার পরিমাণ প্রায় 1.3 কিলোওয়াট বিদ্যুতের সমান। যদি আমরা পতিত সূর্যরশ্মির একটা বড় অংশ চিরাচরিত শক্তিতে রূপান্তর করতে পারি তবে শক্তির সংকট থাকবে না। যেহেতু সৌর বিকিরণে পাওয়া সৌরশক্তিকে ব্যবহারের উপযুক্ত করার সঠিক প্রযুক্তি নেই এবং এই শক্তিকে সরাসরি অন্য শক্তি যেমন বিদ্যুৎ শক্তিতে রূপান্তরিত করা যায় না, তা না হলে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের মোট প্রয়োজনীয় শক্তি 32 মিনিটের সৌর বিকিরণেই পাওয়া যেত।

সৌরশক্তি অনিয়মিত এবং নিয়ন্ত্রণাধীন নয় ফলে রাতের বেলা বা মেঘলা আকাশে একে পাওয়া যায় না। যদিও শক্তির উৎস হিসাবে সূর্যরশ্মির ক্ষমতা অসীম কিন্তু এর ব্যবহার ও প্রয়োগের

সীমাবদ্ধতাই সৌরশক্তি উৎসের প্রধান অন্তরায়। অতএব আধুনিক বিজ্ঞানের একমাত্র চিন্তা সৌরশক্তির ব্যবহারে নতুন প্রযুক্তির আবিষ্কার। এ পথেই মিলবে শক্তির সংকটের থেকে উদ্ধার হওয়ার চাবিকাঠি। তাছাড়া সৌরশক্তি পরিবেশমিত্র বলে পরিবেশ দূষণের কোনও সম্ভভাবনা নেই।

1.6.5.1 সৌরজল উত্তাপক (Solar Water Heater)

তাপশোষককারী চ্যাপ্টা ধাতুর পাত সৌরশক্তি সংগ্রাহক হিসাবে কাজ করে। এই ধাতুর একপ্রান্ত তাপের কুপরিবাহী পদার্থ দিয়ে মোড়া থাকে, ফলে সম্মুখের অংশ সৌরতাপ শোষণ ও বিকিরণ করে। তাপ নিরোধক প্রাচীরে মোড়া জলাশয়ের সঞ্চিত জলে তাপ সংরক্ষিত থাকে। জলাধার থেকে জল একটি নল দিয়ে সংগ্রাহকে যায় এবং আবার জলাশয়ে ফিরে আসে, নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার মাধ্যমে জলের পরিমাণ, গতি এবং সংগ্রাহকের তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রিত থাকে। 2.3 বর্গমিটার সংগ্রাহকে প্রতিদিন 100 লিটার গরম জল (60-80°C) পাওয়া যেতে পারে।

1.6.5.2 সৌরপাচক (Solar Cooker)

সৌরপাচক এক প্রকার বাক্স। যার মধ্যে সূর্যকিরণ থেকে সংগৃহীত তাপ ব্যবহার করে রান্না করা হয়। ফলে কোন প্রচলিত জ্বালানীর প্রয়োজন হয় না। সৌরপাচকের সুবিধা ও অসুবিধাগুলি নিম্নলিখিত :

সুবিধা :

(i) জ্বালানী সাশ্রয় ও দূষণ প্রতিরোধ

(ii) কম তাপমাত্রার ফলে খাদ্যগুণ বজায় থাকা

(iii) শ্রমের সাশ্রয় হয়

(iv) দুর্ঘটনার সম্ভভাবনা নেই

(v) রান্না 4-5 ঘণ্টা গরম থাকে

অসুবিধা :

(i) রাত্রে, মেঘলা বা বৃষ্টির দিনে রান্না সম্ভভব নয়

(ii) রুটি বা ভাজা করা যায় না

(iii) আর্থিক দিক দিয়ে সৌরপাচক দামী

1.7 সারাংশ

এই এককটি পাঠ করার পর আপনি যা যা জানতে পেরেছেন সেগুলি হল—

- জ্বালানীর সংজ্ঞা ও জ্বালানীর শ্রেণীবিভাগ
- কঠিন, তরল ও গ্যাসীয় জ্বালানীর উদাহরণ
- তাপনমূল্যের সংজ্ঞা এবং তাপনমূল্যের বিভিন্ন একক
- প্রকৃতিতে কয়লা কিভাবে উৎপন্ন হয়; বিভিন্ন শ্রেণীর কয়লার মধ্যে কোনটির তাপনমূল্য সবচেয়ে বেশি এবং কেন
- পেট্রোলিয়াম ও পেট্রোলের মধ্যে পার্থক্য
- তরল জ্বালানীর সুবিধা
- কোল গ্যাস, প্রোডিউসার গ্যাস ও ওয়াটার গ্যাস কি কি গ্যাসের মিশ্রণে তৈরী
- অচিরাচরিত শক্তির কয়েকটি উৎস
- সৌরশক্তির ব্যবহার

1.8 সর্বশেষ প্রশ্নাবলি

1. সংক্ষিপ্ত প্রশ্নাবলি

(i) জ্বালানীর প্রধান ভাগগুলি উল্লেখ করুন।

(ii) তাপনমূল্য কাকে বলে?

(iii) বিভিন্ন শ্রেণীর কয়লার নাম লিখুন।

(iv) অ্যানথ্রাসাইট কি? এর মূল ব্যবহার কি?

(v) কয়লার অঙ্গারীকরণ প্রক্রিয়া বলতে কি বোঝেন?

(vi) আলকাতরা ও গ্যাসকার্বনের ব্যবহার উল্লেখ করুন।

(vii) প্রোডিউসার গ্যাস ও ওয়াটার গ্যাস কিভাবে প্রস্তুত করা হয়? এই গ্যাস দুটিতে কি কি গ্যাসের মিশ্রণ থাকে?

(viii) অপরিশুদ্ধ পেট্রোলিয়ামের আংশিক পাতনে উদ্ভূত মূল পদার্থগুলির নাম, তাপমাত্রা উল্লেখ করে লিখুন। যে কোন দুটির ব্যবহার উল্লেখ করুন।

(ix) কঠিন জ্বালানী অপেক্ষা তরল জ্বালানী ব্যবহারের সুবিধাগুলি উল্লেখ করুন।

(x) জ্বালানী কোষ কি?

(xi) জৈব গ্যাস বলতে কি বোঝেন?

(xii) এল. পি. জি.-এর পুরো নাম কি? এই গ্যাসে সামান্য পরিমাণ জৈব সালফাইড মেশান হয় কেন?

(xiii) সৌর জল উত্তাপক কি? সৌরপাচকের সুবিধা এবং অসুবিধাগুলি উল্লেখ করুন।

2. সঠিক উত্তরটি নির্বাচন করুন :

(i) নীচের মৌলগুলির মধ্যে কোনটি কয়লার তাপনমূল্য কমিয়ে দেয়?

(a) কার্বন

(b) অক্সিজেন

(c) হাইড্রোজেন

(d) সালফার

(ii) কার্বনের সর্বাধিক শতকরা পরিমাণ কোন্ কয়লাতে পাওয়া যায়?

(a) অ্যানথ্রাসাইট কোল

(b) বিটুনিমাস কোল

(c) পিট

(d) লিগনাইট

(iii) একটি নমুনা কয়লার তাপনমূল্য বেশি হবে যদি উহার—

(a) জলীয় পদার্থের পরিমাণ বেশি থাকে

(b) উদ্বায়ী পদার্থের পরিমাণ বেশি থাকে

(c) কার্বনের পরিমাণ বেশি থাকে

(iv) যে জ্বালানী হাইড্রোজেনের উৎস হিসাবে ব্যবহৃত হতে পারে তা হল—

(a) প্রোডিউসার গ্যাস

(b) প্রাকৃতিক গ্যাস

(c) কোল গ্যাস

3. শূন্যস্থান পূরণ করুন :

(a) ওয়াটার গ্যাসের তাপনমূল্য প্রোডিউসার গ্যাসের তাপনমূল্য অপেক্ষা ———।

(b) ——— শিল্পের উপজাত পদার্থ হল নিঃশোষিত চুন।

1.9 উত্তরমালা

1. (i) 1.3 দেখুন।

(ii) 1.2 দেখুন।

(iii) 1.3.2 দেখুন।

(iv) 1.3.2 দেখুন।

(v) এবং

(vi) 1.3.4 দেখুন।

(vii) 1.5.1 এবং 1.5.2 দেখুন।

(viii) 1.4.1 দেখুন।

(ix) 1.4.2 দেখুন।

(x) 1.6 এর (ii) দেখুন।

(xi) 1.6.1 দেখুন।

(xii) 1.6.2 দেখুন।

(xiii) 1.6.5.1 এবং 1.6.5.2 দেখুন।

2. (i) (খ)

(ii) (ক)

(iii) (গ)

(iv) (খ)

3. (a) বেশি

(b) কোল গ্যাস।

একক 2 □ জলদূষণ (Water Pollution)

গঠন

2.0 প্রস্তাবনা

উদ্দেশ্য

2.1 জলের প্রাকৃতিক উৎস

2.1.1 জলদূষণের উৎসসমূহ

2.1.2 জলদূষণের শ্রেণীবিভাগ

2.2 জলদূষণের কয়েকটি ঘটনা

2.3 জলদূষণ নিয়ন্ত্রণ

2.4 জলের দূষণ মুক্তকরণ

2.4.1 জলের প্রাথমিক পরিশোধন

2.4.2 জলের দ্বিতীয় পর্যায়ের পরিশোধন

2.4.3 জলের তৃতীয় পর্যায়ের পরিশোধন

2.5 পানীয় জলের আন্তর্জাতিক প্রমাণমাত্রা

2.6 জলে দ্রবীভূত অক্সিজেন

2.7 রাসায়নিক অক্সিজেন চাহিদা

2.8 জৈব রাসায়নিক অক্সিজেন চাহিদা

2.9 জলে মোট দ্রবীভূত কঠিন পদার্থ

2.10 জলের খরতা

2.11 সারাংশ

2.12 সর্বশেষ প্রশ্নাবলি

2.13 উত্তরমালা

2.0 প্রস্তাবনা

জীবনধারণের জন্য জলের প্রয়োজনীয়তা অপরিহার্য। পৃথিবীর মোট জলসম্পদের 97% সমুদ্রে থাকে, 2% জল মেরু অঞ্চলে বরফ ও হিমবাহ হিসাবে থাকে এবং মাত্র 1% জল নদী, হ্রদ বা পুকুরে থাকে যা মানুষের ব্যবহারযোগ্য। পৃথিবীর মধ্যে জল হচ্ছে একমাত্র পদার্থ যা তরল, কঠিন ও বাষ্পীয় অবস্থায় অবস্থান করে। সূর্যের তাপে নদী/সমুদ্রের জল বাষ্পে পরিণত হয়ে বায়ুমণ্ডলে মেঘের সৃষ্টি করে, যা বৃষ্টির মাধ্যমে পৃথিবীতে আবার ফিরে আসে। এইভাবে পৃথিবীর মোট জল স্থির থাকে এবং জলচক্র নিয়ন্ত্রিত হয়। জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও শিল্পের প্রসারণের সঙ্গে সঙ্গে জলের প্রতি মানুষের চাহিদা দিনে দিনে বৃদ্ধি পাচ্ছে। কিন্তু মানুষের ব্যবহারযোগ্য এই জল প্রতিনিয়ত কোনো কৃত্রিম বা পরিবেশগত কারণে ভৌত, রাসায়নিক বা জৈব রাসায়নিক পরিবর্তনের ফলে ব্যবহারের অযোগ্যে পরিণত হচ্ছে। ইহাকেই জলদূষণ বলা হয়।

উদ্দেশ্য :

এই এককটি পাঠ করে আপনি জানতে পারবেন—

- জলদূষণ বলতে কি বোঝায়
- জলদূষণের কারণগুলি কি কি? এই কারণগুলির মধ্যে যেমন প্রাকৃতিক কারণ আছে তেমনি সভ্যতার ক্রমবিকাশের সঙ্গে সঙ্গে প্রকৃতির উপর মানুষের হস্তক্ষেপে বিভিন্ন উৎসে জল দূষিত হচ্ছে। যেমন মানুষের তৈরী কলকারখানা থেকে বর্জ্য পদার্থ, ফলন বৃদ্ধির জন্য প্রয়োজনের অতিরিক্ত সার প্রয়োগ অথবা পোকা বিনষ্ট করতে কীটনাশক পদার্থের ব্যবহার—এগুলি সবই বৃষ্টির জলে ধুয়ে নদী এবং সমুদ্রে পতিত হয় এবং এর ফলে জল দূষিত হয়
- কিভাবে জলদূষণ নিয়ন্ত্রণ করা যায়
- পানীয় জলের আন্তর্জাতিক প্রমাণমাত্রা বলতে কি বোঝায়
- রাসায়নিক ও জৈব রাসায়নিক অক্সিজেনের চাহিদা কি এবং কিভাবে নির্ণয় করা যায়
- জলে মোট দ্রবীভূত কঠিন পদার্থ এবং জলের খরতা নির্ণয়ের পদ্ধতি

2.1 জলের প্রাকৃতিক উৎস

বৃষ্টির জল : প্রাকৃতিক উৎসগুলির মধ্যে একমাত্র বৃষ্টির জলই বিশুদ্ধ অবস্থায় পাওয়া যায়। কিন্তু কলকারখানার নিকটবর্তী বায়ুমণ্ডলে উপস্থিত কার্বন, নাইট্রোজেন ও সালফার ডাইঅক্সাইডসমূহ বৃষ্টির জলে দ্রবীভূত হয়ে অম্লবৃষ্টির মাধ্যমে পৃথিবীর মাটিতে ফিরে আসে।

নদীর জল : বৃষ্টির জল পৃথিবীর মাটির উপর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে নদীতে প্রবেশ করে। মাটির উপর দিয়ে প্রবাহিত হবার সময় মাটির মধ্যে উপস্থিত Na, K, Mg প্রভৃতি ধাতুর সালফেট, ক্লোরাইড ইত্যাদি লবণ জলের মধ্যে দ্রবীভূত হয়ে যায়। জমিতে অতিরিক্ত সার, কীটনাশক রাসায়নিক পদার্থ বৃষ্টির জলে দ্রবীভূত অথবা প্রলম্বিত অবস্থায় নদীর জলে মিশে জল দূষিত করে। এছাড়া কলকারখানার বর্জ্য পদার্থও নদীর জলকে দূষিত করে।

ঝরনার জল : বৃষ্টির জল মাটির মধ্য দিয়ে ভূগর্ভস্থস্তরে জমা হয়। পাহাড়ের বৃষ্টির জল ঝরনার আকারে বের হয়ে আসে।

সমুদ্রের জল : নদীর জল সমুদ্রে গিয়ে পড়ে। সমুদ্রের জলে অধিক পরিমাণে খনিজ লবণ, জৈব পদার্থ ও বর্জ্য পদার্থ মিশে থাকার জন্য মানুষ এই জল ব্যবহার করতে পারে না। এই জল লবণাক্ত। প্রাকৃতিক জলের মধ্যে সমুদ্রের জল সবচেয়ে দূষিত।

2.1.1 জলদূষণের উৎসসমূহ

প্রাকৃতিক উৎসসমূহ : জীবজন্তু ও গাছপালার মৃত্যুজনিত পদার্থ, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতে উদ্ভুত পদার্থ, পাহাড় ও ভূমির ক্ষয়ে উৎপন্ন পদার্থসমূহ জলাবহিত হয়ে নদীতে এসে পড়ে এবং নদীর জল দূষিত হয়। নদীর জল দূষিত হবার উল্লেখযোগ্য কয়েকটি কারণ আগেই বলা হয়েছে।

কৃত্রিম উৎসসমূহ : কলকারখানা, শিল্পাঞ্চল থেকে নির্গত পদার্থ, মানুষের মলমূত্র, গৃহপালিত পশুর খাবার অবশেষ নদীর জলে মিশে ইহাকে দূষিত করে।

2.1.2 জলদূষণের শ্রেণীবিভাগ

(i) **জৈবদূষক পদার্থসমূহ** : জলজ প্রাণী ও উদ্ভিদের জন্য জলে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ 4–6 ppm হওয়া উচিত। গৃহস্থ বাড়ীর ফেলে দেওয়া অপ্রয়োজনীয় পদার্থ, মানুষ ও গৃহপালিত পশুর মলমূত্র, কৃষিকাজে ব্যবহৃত পদার্থসমূহ জলে মিশে জলে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ কমিয়ে দেয়। এর ফলে জলজ প্রাণী ও উদ্ভিদ ক্ষতিগ্রস্থ হয়। জামাকাপড় ও শরীর পরিষ্কার করার জন্য

যথাক্রমে কৃত্রিম ডিটারজেন্ট ও সাবান ব্যবহার করা হয়। ডিটারজেন্টের মধ্যে নানারকমের উৎসেচক থাকে, যা অতি কম পরিমাণে থেকে ফেনার সৃষ্টি করে। এর ফলে জল বাতাস শোষণ করতে পারে না, তাই জলে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ কমে যায়। গৃহপালিত পশু, মানুষের মলমূত্র পুকুর ও নদীর জলে মেশার ফলে, বিভিন্ন প্রকার রোজজীবাণু দ্বারা জল দূষিত হয়। জলবাহিত উল্লেখযোগ্য রোগসমূহ হল আমাশয়, কলেরা, টাইফয়েড, হেপাটাইটিস, জন্ডিস ইত্যাদি।

মানুষের নিত্যপ্রয়োজনীয় কিছু জৈব রাসায়নিক পদার্থ যেমন প্লাস্টিক জাতীয় পদার্থ, ডিটারজেন্ট, জীবাণুনাশক পদার্থ ইত্যাদি প্রস্তুতির সময় কিছুটা বিভিন্নভাবে মাটিতে পড়ে যায়, যাহার বেশীর ভাগই জলে মিশে উদ্ভিদ, জীব ও মানুষের প্রভূত ক্ষতিসাধন করে। এই সকল পদার্থের বেশীর ভাগই জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়া দ্বারা সহজে বিয়োজিত হয় না। ইহারা জলের গুণ নষ্ট করে। ফলে জলে বসবাসকারী প্রাণী, উদ্ভিদ প্রভৃতির ক্ষতিসাধন করে।

কৃষিকাজজনিত কাজের জন্য চাষীরা নানাধরনের রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করে। যেমন পোকা মারার জন্য প্যারাথায়ন, ইথায়ন প্রভৃতি, আগাছা এবং অপ্রয়োজনীয় গাছপালা ধ্বংস করার জন্য 2, 4-ডাইক্লোরোফিনক্সি অ্যাসিড ব্যবহার করা হয়। এই সকল কীটনাশক পদার্থসমূহ স্প্রে করার সময় বাতাসে মিশে যায় এবং কাছাকাছি কোনো পুকুর বা জলাশয়ে পড়ে। বৃষ্টির জল দ্বারাও এই সকল পদার্থ বিভিন্ন জলাশয়ে গিয়ে মেশে এবং জল দূষিত করে।

(ii) **অজৈবদূষক পদার্থসমূহ :** পৃথিবীর সমস্ত উন্নয়নশীল দেশেই শিল্পের প্রসারণের জন্য প্রচুর পরিমাণে জল ব্যবহার হয় এবং এখান থেকে প্রচুর পরিমাণে দূষিত পদার্থ জলের সঙ্গে মিশে জলকে দূষিত করে। বিভিন্ন ধরনের অ্যাসিড যেমন হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড, নাইট্রিক অ্যাসিড ইত্যাদি; উপাদানকারী কারখানা থেকে প্রচুর পরিমাণে বর্জ্য পদার্থ জলের মধ্যে মিশে জলের অম্লদূষণ করে। কস্টিক সোডা, চুন, কলিচুন উৎপাদনকারী কারখানা থেকেও প্রচুর পরিমাণে বর্জ্য পদার্থ জলে মিশে জলের ক্ষার দূষণ করে। নাইট্রেট (NO_3^-), নাইট্রাইট (NO_2^-), সালফেট (SO_4^{2-}), প্রভৃতি অ্যানায়নযুক্ত এবং কপার (Cu), ম্যাঙ্গানীজ (Mn), মারকারী (Hg), সীসা (Pb) প্রভৃতির লবণ ক্ষতিকারক সীসার উপর থাকলে দীর্ঘস্থায়ী দূষণ সমস্যার সৃষ্টি করে।

সীসা দূষণের প্রধান উৎস হল ইস্পাত ও রঙ শিল্প। এছাড়া টেট্রাইথাইল লেড গাড়িতে অ্যান্টিনক যৌগ হিসাবে গ্যাসোলিনে ব্যবহৃত হয়। এর ফলে জলে এবং বায়ুতে সীসার পরিমাণ ক্রমে বৃদ্ধি পাচ্ছে। সীসা দূষিত জল গ্রহণ করলে শরীরের বিপাকীয় প্রক্রিয়ার বিঘ্ন ঘটে।

ইদানীং আর্সেনিকজনিত দূষণ এক ভয়াবহ আকার ধারণ করেছে। আর্সেনিক দূষিত জল গ্রহণ করার ফলে বিভিন্ন ধরনের মারাত্মক চর্মরোগের সৃষ্টি হচ্ছে।

(iii) **পলি** : বন্যাপ্লবিত অঞ্চল, কৃষিকাজ, ভূমিক্ষয়, বুলডোজার চালানো শহর এলাকা থেকে ধুয়ে আসা মাটি ও খনিজ পদার্থের ক্ষুদ্র কণা থেকে পলি উৎপন্ন হয়। এই পলি নদীপথ এবং নদীগর্ভকে বুজিয়ে নদীর গভীরতা হ্রাস করে। ভাকরা, মাইথন প্রভৃতি জলাধারে পলি পড়ার ফলে এখানে বেশি জল ধরে রাখা যাচ্ছে না। এর ফলে বর্ষাকালে বন্যা বেশি হচ্ছে এবং গ্রীষ্মকালে সেচের জন্য পরিমাণমত জল পাওয়া যাচ্ছে না। নদীতে বেশী পরিমাণে পলি পড়ার ফলে নদীবন্দরগুলিতে জাহাজ চলাচল বিঘ্নিত হচ্ছে। পাম্পিং এবং টারবাইন ব্যবস্থায় ক্ষয়ের ফলে জলে প্রয়োজনীয় সূর্যালোক প্রবেশ করতে পারছে না, ফলে জলের নীচের উদ্ভিদসমূহের সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়া বাধা পাচ্ছে।

(iv) **তেজস্ক্রিয় পদার্থসমূহ** : নিউক্লিয় অস্ত্র, নিউক্লিয় ঔষধ, নিউক্লিয় গবেষণাগার থেকে প্রচুর পরিমাণে তেজস্ক্রিয় পদার্থ জল দূষিত করে। খনি থেকে তেজস্ক্রিয় মৌলের নিষ্কাশনের সময়েও কিছু তেজস্ক্রিয় পদার্থ জলে মেশে। তেজস্ক্রিয় সমস্থানিকসমূহ যেমন Ra^{226}, U^{236}, Pu^{239}, Ba^{140} প্রভৃতি জলের নীচে পলিতে জমা হয় এবং জৈবচক্রে প্রবেশ করে এবং শরীর ও স্বাস্থ্যের উপর দীর্ঘস্থায়ী প্রভাব ফেলে। জলে উপস্থিত অতি সামান্য তেজস্ক্রিয় পদার্থ ক্যান্সার সৃষ্টি করে এবং DNA ধ্বংস করে।

(v) **তাপীয় দূষকসমূহ** : বিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে বিদ্যুৎ উৎপাদনের সময় জলীয় বাষ্পকে শীতল ও ঘনীভূত করার জন্য প্রচুর পরিমাণে জল লাগে। ফলে জলের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায় এবং এই উষ্ণ জল নদী বা হ্রদে নিক্ষেপ করা হয়। এর ফলে নদী বা হ্রদের জলের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়। ফলে, মাছের জীবনধারণ কঠিন হয়ে পড়ে। তাপমাত্রা বৃদ্ধির ফলে জলের ঘনত্ব ও অক্সিজেনের পরিমাণ কমে যায়, ফলে জলজ প্রাণীর পরিপাকক্রিয়া নষ্ট হয়।

(vi) **অতি পৌষ্টিকতা (Eutrophication) ও জলদূষণ** : চিনিকল, কসাইখানা, কাগজের কল, দুগ্ধকেন্দ্র প্রভৃতি শিল্পের বর্জিত ময়লা জলে নানাধরনের পুষ্টিকর পদার্থ দ্রবীভূত অথবা প্রলম্বিত অবস্থায় থাকে। এই জল উৎস থেকে নিকটবর্তী জলাশয়ে প্রবেশ করলে জলের পৌষ্টিকতা বৃদ্ধি পায়। সেই জলাশয়ের জলে বিশেষ ধরনের উদ্ভিদ (যেমন, নীলচে-সবুজ শ্যাওলা) দ্রুত হারে বাড়তে থাকে। এই অবস্থাকেই 'অতিপৌষ্টিকতা' বলে। এর ফলে জলাশয়ের জলতল শ্যাওলায় আবৃত হয়ে যায়। একে 'শৈবাল বিকাশ' বলে। অবশেষে শ্যাওলায় মৃতাবশেষ পচে বাতাসে দুর্গন্ধ ছড়িয়ে পড়ে এবং বিয়োজনকারী ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাকের সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। ফলে জলের

অক্সিজেনের পরিমাণ ভীষণভাবে কমে যায়। জলে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ কমে যায় বলে জলজপ্রাণী, যেমন মাছ, অক্সিজেনের অভাবে মারা যায়।

জলের এই অতিপৌষ্টিকতাজনিত সমস্যা সমাধানের সম্ভভাব্য উপায়গুলি হল—

(a) প্রযুক্তির মাধ্যমে উৎসের বর্জির জল থেকে পুষ্টিকর পদার্থগুলির অপসারণ; এই পদ্ধতি ব্যয়সাপেক্ষ

(b) পুষ্টিসমৃদ্ধ জল সেচের কাজে ব্যবহার করা

(c) জলাশয়ের শৈবাল ও জলজ উদ্ভিদ থেকে জৈব গ্যাস তৈরী করা

অনুশীলনী—1

(a) জলদূষণ বলতে কি বোঝায়?

(b) জলের প্রধান উৎসসমূহ কি কি?

(c) জলদূষণের গুরুত্বপূর্ণ উৎসগুলির নাম লিখুন।

(d) জলজ প্রাণী ও উদ্ভিদের জীবনধারণের জন্য জলে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ কত হওয়া উচিত?

(e) কৃত্রিম ডিটারজেন্ট কিভাবে জল দূষিত করে?

(f) জলবাহিত কয়েকটি রোগের নাম করুন।

2.2 জলদূষণের কয়েকটি ঘটনা

(i) জাপানের মিনিমাটা অঞ্চলে ভিনাইল ক্লোরাইড উৎপন্ন করার কারখানা থেকে প্রচুর পরিমাণে মার্কিউরিক ক্লোরাইড [$HgCl_2$] সমুদ্রে ফেলা হত। এই পারদ যৌগ সমুদ্রের তলার মাটির জীবাণুর দ্বারা ডাই-মিথাইল মার্কারী [$(CH_3)_2Hg$] যৌগ তৈরী করে যা মাছের শরীরে প্রবেশ করে। এই মাছ খাওয়ার ফলে 1953 সালে এই অঞ্চলের মানুষ স্নায়ুরোগে আক্রান্ত হয়।

(ii) 1973 সালে আমেরিকার মিচিগান শহরে ভুলবশতঃ ম্যাগনেশিয়াম অক্সাইড [MgO] মনে করে পলিব্রোমিনেটেড বাই ফিনাইল (PBB) পশুর খাবারের সঙ্গে মেশানো হয়। ফলে প্রচুর গরু, কুকুর, মুরগী মারা যায়।

(iii) 1988 সালে ইংল্যান্ডের জলশোধন কেন্দ্রে 200 টন অ্যালুমিনিয়াম সালফেট [$Al_2(SO_4)_3$] জলের সঙ্গে মিশে যায়। ফলে জলে Al-এর মাত্রা অনেক বেড়ে যায়। এই জল গ্রহণের ফলে এই অঞ্চলের মানুষের মুখে ঘা, পাকস্থলীর প্রদাহ ইত্যাদির লক্ষণ দেখা দেয়।

2.3 জলদূষণ নিয়ন্ত্রণ

জলদূষণ বৃদ্ধির প্রধান কারণ জনসংখ্যা বৃদ্ধি ও উন্নত শিল্প প্রযুক্তির বিকাশ। জলদূষণ নিয়ন্ত্রণ করার জন্য জাতিগতভাবে এবং সরকারী ও আন্তর্জাতিকভাবে প্রচেষ্টা নেওয়া দরকার। প্রত্যেক মানুষকে জলের প্রকৃতি এবং প্রাণীজগতে এর প্রভাব সম্ভবন্ধে জানার জন্য যথেষ্ট শিক্ষিত হতে হবে। জলের মধ্যে প্রাণীর বা মানুষের ব্যবহৃত নোংরা বর্জ্য পদার্থ ছোঁড়া থেকে নিজেকে সংযত রাখতে হবে। পৌরসংস্থাগুলিকে নর্দমার সুব্যবস্থা করতে হবে এবং জলদূষণ নিয়ন্ত্রণ পরিকল্পনার কাজে সরকারকে নির্দিষ্ট তহবিল গড়তে হবে। 1974 সালে জলদূষণ আইন পাশ করে ভারত সরকার জলদূষণ নিয়ন্ত্রণের জন্য গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ নিয়েছে।

2.4 জলের দূষণ মুক্তকরণ

জলের মধ্যে উপস্থিত জৈব বর্জ্য পদার্থ, অব্যবহার্য প্লাস্টিকের দ্রব্য, ধাতুর টুকরো, সংক্রামক জীবাণু, ধুলো, বালি মিশে থাকে। এই সকল ক্ষতিকারক দূষিত পদার্থসমূহ দূর করে বিশুদ্ধ জল প্রস্তুত করা যায়। নিম্নলিখিত কয়েকটি উপায়ে পৌর অঞ্চলের নর্দমার জল, শিল্প কারখানার বর্জ্য জল পরিশোধন করা হয়।

2.4.1 জলের প্রাথমিক পরিশোধন

থিতান : গৃহস্থালি ও কারখানার পরিত্যক্ত জলে প্লাস্টিকের দ্রব্য, ধাতুর টুকরো, কাচের টুকরো, কাঠ ইত্যাদি থাকে। এই সকল পদার্থ বাহিত নালার মুখে ধাতুনির্মিত ছাঁকনী লাগিয়ে অপেক্ষাকৃত বড় আকারের কঠিন পদার্থ ছেঁকে পৃথক করা হয়। এরপর এই জল সরু ছাঁকনীর মধ্য দিয়ে পাঠানো হয়। এরপর ঐ জলকে বড় জলাধারে রেখে থিতানো হয়। এর ফলে বালি, মাটি, কাদা ও ভারী ধুলিকণা থিতিয়ে পড়ে।

তঞ্চন : অবিশুদ্ধ জলকে থিতান ট্যাঙ্কে কয়েকদিন রাখার পর, এর মধ্যে ফটকিরি [যেমন পটাশ অ্যালাম K_2SO_4, $Al_2(SO_4)_3$, $24H_2O$] যোগ করা হয়। এর ফলে ছোট ছোট কণাগুলি একত্রিত হয়ে বড় কণায় পরিণত হয় এবং থিতিয়ে পড়ে।

পরিস্রাবণ : থিতিয়ে পড়া কাদা, ময়লা থেকে উপরের জলকে পরিস্রাবণের মাধ্যমে পৃথক করা হয়। এরজন্য ঐ জলকে বালির স্তরের মধ্য দিয়ে চালনা করা হয়।

সংক্রামক জীবাণু দূরীকরণ : পরিস্রুত জলকে জীবাণুশূন্য করার জন্য ক্লোরিন কিংবা ব্লিচিং পাউডার দিয়ে সমস্ত জলকে আলোড়ন করা হয়। ক্লোরিনের পরিমাণ বেশী হলে জলে উপস্থিত জৈব যৌগের সঙ্গে বিক্রিয়া করে ক্লোরিনেটেড হাইড্রোকার্বন তৈরী হয়, যা ক্যান্সার রোগের সৃষ্টি করে। এইজন্য জলের জীবাণু দূর করার জন্য ক্লোরিন ব্যবহার না করে অতিবেগুনী রশ্মি বা ওজোন ব্যবহার করা হয়।

2.4.2 জলের দ্বিতীয় পর্যায়ের পরিশোধন

এই পর্যায়ে জীবাণু, ছত্রাক, প্রোটোজোয়া প্রভৃতি জীবন্ত আণবিক পদার্থের সাহায্যে জলে উপস্থিত দ্রবীভূত এবং কলয়ডীয় জৈব পদার্থসমূহকে জৈব রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় অপসারিত করা হয়। এই প্রক্রিয়ায় জীবন্ত আণবিক পদার্থ জলে উপস্থিত জৈব পদার্থগুলিকে খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করে এবং উহাদের CO_2তে জারিত করে। নাইট্রোজেন যুক্ত জৈব পদার্থসমূহ অ্যামোনিয়া এবং নাইট্রেট ও নাইট্রাইটে পরিণত হয়।

2.4.3 জলের তৃতীয় পর্যায়ের পরিশোধন

রাসায়নিক পদ্ধতি : এই পদ্ধতিতে জলে ফেরাস সালফেট, অ্যালুমিনিয়াম সালফেট মিশিয়ে জলে উপস্থিত কলয়ডীয় কণার অধঃক্ষেপ ফেলা হয় এবং বালির স্তরের ছাঁকনীর মধ্য দিয়ে পাঠান হয়। এরপর পরিস্রুত জলে কলিচুন যোগ করে জলে উপস্থিত ফসফেট ক্ষারকীয় ফসফেটরূপে অধঃক্ষিপ্ত করা হয়। অবশিষ্ট জৈব পদার্থ অপসারণের জন্য সক্রিয় অঙ্গারের মধ্য দিয়ে চালনা করা হয়। এরপর ঐ পরিস্রুত জলে ওজোন বা ক্লোরিন মিশিয়ে জীবাণুমুক্ত করা হয়।

আয়ন বিনিময় পদ্ধতি : জলে অনেক সময় ক্যালসিয়াম ও ম্যাগনেসিয়ামের সালফেট, ক্লোরাইড প্রভৃতি লবণ দ্রবীভূত হয়ে থাকে। পানীয় জলের ক্ষেত্রে ও লন্ড্রীর কাজের ক্ষেত্রে এই জল উপযুক্ত নয়। এইজন্য এই জলকে ক্যাটায়ন এবং অ্যানায়ন বিনিময়কারী রেজিনের মধ্য দিয়ে চালনা করা হয়। ক্যাটায়ন বিনিময়কারী রেজিন হল উচ্চ আণবিক ওজোনযুক্ত পলিমার যৌগ যেখানে কার্বক্সিল

(—COOH) বা সালফোনিক অ্যাসিড মূলক (—SO_3H) থাকে এবং অ্যানায়ন বিনিময়কারী রেজিন হল উচ্চ আণবিক ওজনের অ্যামিন যৌগ। এই দুই প্রকার রেজিনের মধ্যে জল চালনা করলে জল আয়নমুক্ত হয়ে মৃদু জলে পরিণত হয়।

বাতাস্বিতকরণ : উচ্চ চাপের বায়ুকে মৃদু জলের মধ্য দিয়ে পাঠিয়ে বুদবুদ আকারে বের করে দেওয়া হয়। এর ফলে মৃদু জলের মধ্যে উপস্থিত কার্বন ডাইঅক্সাইড, হাইড্রোজেন সালফাইড প্রভৃতি গ্যাস দূর হয় এবং জলে অক্সিজেনের পরিমাণ বৃদ্ধি পায়।

2.5 পানীয় জলের আন্তর্জাতিক প্রমাণমাত্রা

বিচার্য বিষয়ের ধ্রুবক	সর্বাধিক অনুমোদিত মান	WHO অনুমোদিত মান	ISI অনুমোদিত মান
pH	6-8.5	6.5-9.5	6-9
আপেক্ষিক পরিবাহিতা	300 μ mho cm^{-1}	—	—
রাসায়নিক অক্সিজেন চাহিদা	4.0 মিগ্রা/লি	90 মিগ্রা/লি	—
জৈব রাসায়নিক অক্সিজেন চাহিদা	5.0 মিগ্রা/লি	6.0 মিগ্রা/লি	—
দ্রবীভূত অক্সিজেন	4-6 মিগ্রা/লি	—	—
মোট দ্রবীভূত কঠিন পদার্থ	500 মিগ্রা/লি	500 মিগ্রা/লি	—
লৌহ	0.3 মিগ্রা/লি	1 মিগ্রা/লি	—
ম্যাঙ্গানীজ	0.05 মিগ্রা/লি	0.5 মিগ্রা/লি	0.01 মিগ্রা/লি
সীসা	0.05 মিগ্রা/লি	0.1 মিগ্রা/লি	0.01 মিগ্রা/লি
আর্সেনিক	0.05 মিগ্রা/লি	0.05 মিগ্রা/লি	0.02 মিগ্রা/লি
নাইট্রেট ও নাইট্রাইট	10 মিগ্রা/লি	45 মিগ্রা/লি	—
ফ্লুওরাইড	1.5 মিগ্রা/লি	—	3 মিগ্রা/লি

অনুশীলনী—2

(a) জলদূষণের ফলে উদ্ভুত কয়েকটি ঘটনা উল্লেখ করুন।

(b) দূষিত জলের প্রাথমিক পরিশোধনের ধাপগুলি উল্লেখ করুন।

(c) আয়ন বিনিময় পদ্ধতিতে জল কিভাবে আয়নমুক্ত করা হয়?

(d) পানীয় জলে সীসার সর্বোচ্চ অনুমোদিত মান কত?

2.6 জলে দ্রবীভূত অক্সিজেন (D.O.)

জলে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ 4–6 ppm হওয়া দরকার। জলের ভৌত, রাসায়নিক এবং জৈবিক কার্যের উপর জলে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ নির্ভর করে। জৈব পদার্থের দূষণের ফলে জলে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ কমে যায়। দূষিত জলের মধ্যে উপস্থিত ব্যাক্টেরিয়া দ্রবীভূত অক্সিজেনকে কার্বন ডাইঅক্সাইডে পরিণত করে। জলে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ কমে গেলে জলজ প্রাণী ও উদ্ভিদের ব্যাপক ক্ষতি হয়। জলে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণের উপর কোন্ জল কতটা দূষিত বলা যায়।

জলে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ আয়োডোমিতি পদ্ধতিতে নির্ণয় করা হয়। একটি বিশেষ ধরনের ছিপিযুক্ত কাঁচের বোতলে ভর্তি করে দূষিত জল নেওয়া হয়। এর মধ্যে ক্ষারীয় পটাসিয়াম আয়োডাইড এবং ম্যাঙ্গানাস সালফেট যোগ করা হয়, এতে ম্যাঙ্গানাস হাইড্রক্সাইড অধঃক্ষিপ্ত হয়। জলে দ্রবীভূত অক্সিজেন দ্বারা ম্যাঙ্গানাস হাইড্রক্সাইড ক্ষারকীয় ম্যাঙ্গানীক হাইড্রক্সাইডে পরিণত হয়। এর মধ্যে ঘন সালফিউরিক অ্যাসিড যোগ করলে ক্ষারকীয় ম্যাঙ্গানীক হাইড্রক্সাইড জলে দ্রবীভূত অক্সিজেনের সমতূল্য আয়োডিন মুক্ত করে, যা প্রমাণ সোডিয়াম থায়োসালফেট দ্রবণ দিয়ে স্টার্চ নির্দেশক ব্যবহার করে প্রশমিত করা হয়। ব্যবহৃত সোডিয়াম থায়োসালফেটের আয়তন থেকে জলে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ নির্ণয় করা হয়।

2.7 রাসায়নিক অক্সিজেন চাহিদা

যে পরিমাণ অক্সিজেন রাসায়নিকভাবে অ্যাসিডযুক্ত পটাসিয়াম ডাইক্রোমেটের সমতূল্য, তাকে রাসায়নিক অক্সিজেন চাহিদা বলে।

250 মিলিলিটার গোলতলা যুক্ত কাঁচের পাত্রে নির্দিষ্ট পরিমাণ নমুনা জলের সঙ্গে অতিরিক্ত প্রমাণমাত্রার পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট দ্রবণ, ঘন সালফিউরিক অ্যাসিড, 1 গ্রাম সিলভার সালফেট এবং 1 গ্রাম মারকিউরিক সালফেট যোগ করা হয় এবং মিশ্রণটি 6 ঘণ্টা ধরে ফোটানো হয়। এরপর মিশ্রণটি ঠাণ্ডা করে মোরের লবণ (ফেরাস অ্যামোনিয়াম সালফেট) দিয়ে ফেরোইন নির্দেশকের উপস্থিতিতে প্রশমিত করা হয়।

গণনা ঃ ধরা যাক, নমুনা জলের পরিমাণ = V মিলি, জলে যুক্ত নির্দিষ্ট পরিমাণ পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট প্রশমন করতে প্রয়োজনীয় মোর লবণ দ্রবণের পরিমাণ = V_1 মিলি, জারণ সম্পূর্ণ হওয়ার পর উদ্বৃত্ত পটাশিয়াম ডাইক্রোমেট প্রশমন করতে প্রয়োজনীয় মোর লবণ দ্রবণের পরিমাণ

= V_2 মিলি। সুতরাং শুধুমাত্র জৈব পদার্থ জারণের জন্য প্রয়োজনীয় মোর লবণ দ্রবণের পরিমাণ $(V_1 - V_2)$ মিলি।

$$\therefore \text{ রাসায়নিক অক্সিজেন চাহিদা } = \frac{(V_1 - V_2)N \times 8000}{V} \text{ গ্রাম/লিটার।}$$

2.8 জৈব রাসায়নিক অক্সিজেন চাহিদা

জলে উপস্থিত জৈব পদার্থের জীবাণু দ্বারা সবাত অবস্থায় বিভাজনের জন্য যে পরিমাণ অক্সিজেন প্রয়োজন হয়, তাকে জৈব রাসায়নিক অক্সিজেন চাহিদা বলে। নির্দিষ্ট পরিমাণ নমুনা জল বায়ুনিরোধক পাত্রে নিয়ে 20°C উষ্ণতায় 5 দিন ধরে রেখে দেওয়া হয়। প্রথমে এবং 5 দিন পরে জলে উপস্থিত অক্সিজেনের পরিমাণের পার্থক্য থেকে জৈব রাসায়নিক অক্সিজেনের চাহিদা নির্ণয় করা হয়।

2.9 জলে মোট দ্রবীভূত কঠিন পদার্থ

জলে উপস্থিত দ্রবীভূত, প্রলম্বিবত ও থিতিযোগ্য সমস্ত কঠিন পদার্থকে মোট দ্রবীভূত কঠিন পদার্থ বলা হয়। জলে মোট দ্রবীভূত কঠিন পদার্থ নির্ণয়ের জন্য একটি পোর্সেলিন পাত্রের নির্দিষ্ট ওজন নেওয়া হয়। এই পাত্রের মধ্যে নির্দিষ্ট পরিমাণমত জল নিয়ে ধীরে ধীরে বাষ্পীভূত করা হয়। এইভাবে তরল অংশ সম্পূর্ণভাবে দূরীভূত হয়ে গেলে, অবশেষকে আরও শুষ্ক করে নির্দিষ্ট ওজন নেওয়া হয়। দুইটি ওজনের পার্থক্য থেকে জলে দ্রবীভূত মোট কঠিন পদার্থের পরিমাণ নির্ণয় করা হয়।

2.10 জলের খরতা

জলের মধ্যে সাধারণত ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, আয়রণ প্রভৃতির ক্লোরাইড, সালফেট, বাইকার্বনেট লবণ দ্রবীভূত হয়ে থাকে। এই সকল দ্রবীভূত লবণের পরিমাণের উপর জলের খরতার মাত্রা নির্ভর করে। জলের খরতা সাধারণত দুইভাগে ভাগ করা হয়। ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, আয়রণ প্রভৃতির বাইকার্বনেট লবণ জলে দ্রবীভূত থেকে অস্থায়ী খরতার সৃষ্টি করে। স্ফুটনের সাহায্যে জলের এই অস্থায়ী খরতা দূর করা হয়। জলে ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম প্রভৃতির ক্লোরাইড, সালফেট লবণ দ্রবীভূত থাকলে স্থায়ী খরতার সৃষ্টি করে। এই খরতা সাধারণ স্ফুটনের সাহায্যে দূর করা যায় না।

জলের খরতা প্রকাশ করা হয় ক্যালসিয়াম কার্বনেটের তুল্য পরিমাণ ওজন হিসাবে। নমুনা জলের প্রতি দশ লক্ষ ভাগ ওজনে x ভাগ ওজনের ক্যালসিয়াম কার্বনেট বা তার তুল্য পরিমাণে খরতা সৃষ্টিকারী পদার্থ দ্রবীভূত থাকলে, জলের খরতা হয় x ppm. জলের মোট খরতাকে ইথিলিন ডাইঅ্যামিন টেট্রাঅ্যাসেটিক অ্যাসিড (EDTA) দ্বারা প্রশমন করে নির্ণয় করা হয়। 250 মিলি কনিক্যাল পাত্রে নির্দিষ্ট পরিমাণ জল নিয়ে অ্যামোনিয়াম ক্লোরাইড ও অ্যামোনিয়াম হাইড্রক্সাইড বাফার যোগ করে নমুনা জলের pH 10 এর কাছাকাছি রাখা হয়। এরপর ঐ জলে 2 ফোঁটা এরিওক্রোম ব্ল্যাক T নির্দেশক যোগ করে প্রমাণমাত্রার EDTA দ্রবণ দ্বারা প্রশমিত করা হয়। প্রশমন কালে দ্রবণের রঙ লাল থেকে নীল হয়। বিউরেট পাঠ থেকে খরতার পরিমাণ নির্ণয় করা হয়।

1 মিলি 0.01 (N) EDTA $\equiv$ 1.0 মিগ্রা $CaCO_3$

অনুশীলনী—3

(a) জলে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ কিসের উপর নির্ভর করে?

(b) জলে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ কিভাবে নির্ণয় করা হয়?

(c) রাসায়নিক অক্সিজেন চাহিদা কাকে বলে?

(d) জৈব রাসায়নিক অক্সিজেন চাহিদা কাকে বলে?

(e) জলের খরতার মাত্রা কিসের উপর নির্ভর করে?

2.11 সারাংশ

এই এককটি পাঠ করার পর আপনি জলদূষণ সম্ভবন্ধে যে সমস্ত তথ্য জানতে পেরেছেন তার সার-সংক্ষেপ নীচে দেওয়া হল :

- জলদূষণ কাকে বলে
- জলের প্রধান প্রাকৃতিক উৎসগুলি যেমন বৃষ্টির জল, নদীর জল, ঝরনার জল ও সমুদ্রের জল। এই উৎসগুলি থেকে প্রাপ্ত জল কোন্ ক্ষেত্রে সবচেয়ে বিশুদ্ধ এবং সবচেয়ে দূষিত কেন
- জলদূষণ নিয়ন্ত্রণ এবং জলদূষণ মুক্তকরণ পদ্ধতি
- জলে দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ কত হওয়া উচিত এবং কেন দ্রবীভূত অক্সিজেনের পরিমাণ কমে যায়। এর ফলে কি হয়

- জলে রাসায়নিক অক্সিজেনের চাহিদা ও জৈব রাসায়নিক অক্সিজেনের চাহিদা বলতে কি বোঝায় এবং কিভাবে নির্ণয় করা যায়
- জলের খরতা কিসের উপর নির্ভর করে এবং জলের এই খরতা কিভাবে নির্ণয় করা যায়

2.12 সর্বশেষ প্রশ্নাবলি

1. মনে করুন আপনার বাসস্থানের নিকটবর্তী এলাকায় (2 কি:মি: ব্যাসার্ধের মধ্যে) কলেরা রোগ দেখা দিয়েছে। এই রোগের প্রাদুর্ভাবকে তাৎক্ষণিক দমন এবং দীর্ঘস্থায়ী প্রতিরোধ ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য কি কি ব্যবস্থা নেওয়া উচিত বলে আপনি মনে করেন?

2. চাষের জমিতে ফসল বৃদ্ধির জন্য অতিরিক্ত রাসায়নিক সার এবং পোকার আক্রমণ থেকে ফসল রক্ষা করার জন্য অতিরিক্ত কীটনাশক পদার্থ যাতে ব্যবহার করা না হয় তার জন্য কি ব্যবস্থা অবলম্ভবন করা উচিত বলে আপনি মনে করেন?

3. অতিপৌষ্টিকতা কাকে বলে? অতিপৌষ্টিকতাজনিত সমস্যা সমাধানের উপায়গুলি উল্লেখ করুন।

2.13 উত্তরমালা

অনুশীলনী—1

(a) জলে বর্জ্য পদার্থের সংযোগের ফলে জলের ভৌত, রাসায়নিক ও জৈব গুণাবলীর পরিবর্তন হয়। এর ফলে মানুষ ও অন্যান্য প্রাণীর স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকারক হয় এবং মানুষের ব্যবহারের অনুপযোগী হয়ে ওঠে। এই ঘটনাকে জলদূষণ বলা হয়।

(b) জলের প্রধান উৎসগুলি হল, বৃষ্টির জল, নদীর জল, ঝরনার জল এবং সমুদ্রের জল।

(c) প্রাকৃতিক উৎসসমূহ যেমন, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের ফলে উদ্ভুত পদার্থ সমূহ, জীবজন্তু ও গাছপালার মৃত্যুজনিত পদার্থ, ভূমিক্ষয় ইত্যাদি এবং কৃত্রিম উৎসসমূহ যেমন, কলকারখানা ও শিল্পাঞ্চল থেকে উৎপন্ন বর্জ্য পদার্থ, জমিতে ব্যবহৃত অতিরিক্ত সার ও কীটনাশক পদার্থ, সমুদ্রে জাহাজ বা অন্য জলযান চলাচলের ফলে জলের উপরিভাগে যে তেলের আবরণ পড়ে এবং মানুষের মলমূত্র ইত্যাদি।

(d) 4-6 ppm

(e) 2.1.2 দেখুন।

(f) 2.1.2 দেখুন।

অনুশীলনী—2

(a) 2.2 দেখুন।

(b) থিতান, তঞ্চন, পরিস্রাবণ ও সংক্রামক জীবাণু দূরীকরণ।

(c) 2.4.3 দেখুন।

(d) 0.05 মিগ্রা/লি

অনুশীলনী—3

(a) 2.6 দেখুন।

(b) 2.6 দেখুন।

(c) 2.7 দেখুন।

(d) 2.8 দেখুন।

(e) 2.10 দেখুন।

সর্বশেষ প্রশ্নাবলি :

1. ইঙ্গিত—এই রোগ জলের মাধ্যমে সংক্রামিত হয়;

(a) ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা—যেমন ধরুন জল ফুটিয়ে পান করা, জনসাধারণের মধ্যে এ রোগের ভয়াবহতার রূপ ফুটিয়ে তোলা, চিকিৎসকের পরামর্শে প্রতিষেধক ওষুধ গ্রহণ করা, রোগীর মলমূত্র ও বমন ইত্যাদির আশেপাশের জলাশয়ে না ফেলা ইত্যাদি।

(b) সরকারী প্রচেষ্টা—পৌরসংস্থা/গ্রামীণ স্বাস্থ্যকেন্দ্র এবং সরকারের পক্ষ থেকে যথাযথ প্রতিষেধক ব্যবস্থা নিতে হবে—ব্লিচিং পাউডার ছড়ান, গণমাধ্যমকে ব্যবহার করে জনসাধারণের সচেতনতা বৃদ্ধি করা এবং তাৎক্ষণিক কি কি করা উচিত তার পরামর্শ দেওয়া।

3. ইঙ্গিত—প্রয়োজনের অতিরিক্ত সার ও কীটনাশক পদার্থ ব্যবহার করলে সেগুলি বৃষ্টির জলে ধুয়ে নিকটবর্তী জলাশয়ে পড়লে জল দূষিত হবে। তাই বিভিন্ন প্রচার মাধ্যম ব্যবহার করে জলদূষণ এবং পরবর্তী পর্যায়ে স্বাস্থ্য-বিপত্তি সম্ভবন্ধে চাষীদের সচেতন করতে হবে।

3. 2.1.2 এর (vi) দেখুন।

একক 3 □ বায়ুদূষণ (Air Pollution)

গঠন

3.0 প্রস্তাবনা

উদ্দেশ্য

3.1 বায়ুদূষণের উৎসসমূহ

3.2 প্রধান প্রধান বায়ুদূষক গ্যাসসমূহ এবং তাদের উৎস ও ক্ষতিকারক প্রভাব

3.2.1 কার্বন মনোক্সাইড

3.2.2 কার্বন ডাইঅক্সাইড

3.2.3 সালফার ডাইঅক্সাইড

3.2.4 নাইট্রোজেন অক্সাইড

3.2.5 বস্তুকণা

3.2.6 বিষাক্ত ভারী উপাদান

3.3 সবুজঘর বা গ্রীনহাউস প্রভাব

3.3.1 সবুজঘর বা গ্রীনহাউস কী

3.3.2 সবুজঘরের প্রভাবগুলি কী কী

3.3.3 সবুজঘর গ্যাসসমূহ এবং তাদের উৎস

3.3.4 সবুজঘর প্রভাব নিয়ন্ত্রণ

3.4 অম্লবৃষ্টি

3.4.1 অম্লবৃষ্টির উৎস

3.4.2 অম্লবৃষ্টির প্রভাব

3.4.3 অম্লবৃষ্টি নিয়ন্ত্রণ

3.5 ধোঁয়াশা

3.5.1 কেন ধোঁয়াশা সৃষ্টি হয়

3.5.2 ধোঁয়াশার প্রকারভেদ

3.5.3 ধোঁয়াশার প্রভাব

3.6 ওজোন স্তর

3.6.1 বায়ুমণ্ডলে ওজোন স্তরের সৃষ্টি

3.6.2 ওজোন স্তরের বিনষ্টি

3.6.3 ওজোন স্তর ক্ষয়ের প্রভাব

3.6.4 ওজোন স্তর রক্ষা

3.7 বায়ুদূষণের কয়েকটি ঘটনা

3.8 বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ

3.9 সারাংশ

3.10 সর্বশেষ প্রশ্নাবলি

3.11 উত্তরমালা

3.0 প্রস্তাবনা

মানুষ ও তার চারপাশের সমস্ত কিছু নিয়েই পরিবেশ গঠিত হয়। বাড়িঘর, গাছপালা, খালবিল, নদনদী, সাগর-মহাসাগর, কলকারখানা, বৈজ্ঞানিক প্রকল্প ও গবেষণাগার ইত্যাদি সবকিছুই মানুষের পরিবেশের অন্তর্ভুক্ত। Natural Environmental Research Council-এর মতে যে সকল পদার্থ ও শক্তি বর্জ্য পদার্থ হিসাবে মানুষ পরিত্যাগ করে এদের মধ্যে যেগুলি পরিবেশের উপর ক্ষতিকারক পরিবর্তন সাধন করে তাকে দূষণ বলে। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার মতে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের মধ্যে ক্ষতিকারক পদার্থের ঘন সমাবেশ যখন মানুষ ও তার পরিবেশের পক্ষে ক্ষতিকারক হয় তখন তাকে বায়ুদূষণ বলে। জনসংখ্যা বৃদ্ধির জন্য বাসস্থানের প্রয়োজন ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাচ্ছে। মানুষ বনভূমি বিলুপ্ত করে, উচ্চভূমিকে সমতল করে, নদীর গতিপথকে পরিবর্তন করে গ্রাম, শহর, নগর গড়ে তুলছে। সবুজ তৃণভূমি ও শস্যক্ষেত্রের অবলুপ্তি ঘটিয়ে বড় বড় জাতীয় সড়ক, রেলপথ, বাঁধ ইত্যাদি নির্মাণ করা হচ্ছে। নিজের প্রয়োজনে বনাঞ্চল বিলুপ্ত করার জন্য পরিবেশের ভারসাম্য নষ্ট হচ্ছে। শিল্পের ব্যাপক প্রসারের ফলেও বায়ু দূষিত হচ্ছে। স্বচ্ছ বায়ু মানুষ ও জীবকুলের জীবনের অন্যতম উপাদান। বাতাসের মধ্যে যে সকল পদার্থ থাকে, তাদের হঠাৎ বৃদ্ধি বায়ুদূষণের সৃষ্টি করে।

উদ্দেশ্য

বর্তমান এককটি পাঠ করে আপনারা জানতে পারবেন—

- বায়ুদূষণ কী, আর কারা কীভাবে বায়ুকে দূষিত করছে
- বহুশ্রুত সবুজঘর প্রভাব প্রকৃতপক্ষে কী, সবুজঘর গ্যাসসমূহ কী, এদের উৎসই বা কী। এই প্রভাব নিয়ন্ত্রণের উপায়সমূহও জানতে পারবেন
- অম্লবৃষ্টি কী ও কেন
- ওজোন স্তর কী, কীভাবে সৃষ্ট হয়েছে, কীভাবে এদের বিনষ্টি ঘটছে এবং এই বিনষ্টি পরিবেশকে কীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত করছে
- ইতিহাসে বিধৃত বায়ুদূষণের কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা
- বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণের উপায়সমূহ

3.1 বায়ুদূষণের উৎসসমূহ

প্রাকৃতিক উৎস : আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের ফলে উদ্ভূত ছাই, কার্বন ডাইঅক্সাইড ও অন্যান্য গ্যাসসমূহ; ছত্রাক থেকে ভাইরাস ও সূক্ষ্ম কণা; ভূমিপৃষ্ঠ থেকে দাবানল, ধূলা ও মাটির কণা ইত্যাদি।

অপ্রাকৃতিক উৎস : কলকারখানা ও শিল্পাঞ্চল থেকে উৎপন্ন ধোঁয়া, বিষাক্ত গ্যাস; গাড়ি, এরোপ্লেন ও অন্যান্য ইঞ্জিনের ধোঁয়া ও গ্যাস; পারমাণবিক বিস্ফোরণের ফলে উৎপন্ন তেজস্ক্রিয় কণা ও রশ্মি; পৌর আবর্জনা ইত্যাদি।

3.2 প্রধান প্রধান বায়ুদূষক গ্যাসসমূহ এবং তাদের উৎস ও ক্ষতিকারক প্রভাব

3.2.1 কার্বন মনোক্সাইড (CO)

প্রাকৃতিক প্রক্রিয়ায় যেমন আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের সময়, বজ্রবিদ্যুৎপাতের সময় কার্বন মনোক্সাইড উৎপন্ন হয়। এছাড়া মোটরগাড়ি থেকে, জ্বলন্ত সিগারেট থেকে, জৈব পদার্থের দহনের ফলে নির্গত ধোঁয়ায় প্রচুর কার্বন মনোক্সাইড থাকে। বিভিন্ন শিল্পে ব্যবহৃত চুল্লী যেমন, লৌহ-ইস্পাত শিল্প, কয়লা শিল্প থেকে কার্বন মনোক্সাইড বায়ুমণ্ডলে আসে। প্রধানতঃ শহরাঞ্চল এবং

শিল্পাঞ্চলে এই গ্যাসের প্রভাব বেশী দেখা যায়। বাতাসে মোট দূষণকারী পদার্থের 60 শতাংশই হল কার্বন মনোক্সাইড।

ক্ষতিকারক প্রভাব : প্রশ্বাসের সময় কার্বন মনোক্সাইড মানবদেহে প্রবেশ করে এবং রক্তের হিমোগ্লোবিনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে সুস্থিত যৌগ কার্বক্সি-হিমোগ্লোবিন উৎপন্ন করে। ফলে রক্তের অক্সিজেন গ্রহণ ও বহন ক্ষমতা হ্রাস পায় এবং বিপাকীয় বৈকল্য দেখা যায়। এতে কোষের কার্যক্ষমতা কমে যায়। সাধারণতঃ বাতাসে কার্বন মনোক্সাইডের পরিমাণ 10-250 ppm হলে মাথা ধরা, দৃষ্টিশক্তিহীনতা প্রভৃতি উপসর্গ লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু কার্বন মনোক্সাইডের পরিমাণ যদি 500 ppm এর বেশী হয়, তাহলে সেই বাতাস গ্রহণ করলে মানুষ ও জীবজন্তুর মৃত্যু হতে পারে।

3.2.2 কার্বন ডাইঅক্সাইড (CO_2)

কয়লা ও খনিজ তেলের সম্পূর্ণ দহনের ফলে বাতাসে প্রচুর পরিমাণে কার্বন ডাইঅক্সাইডের উৎপত্তি হয়। সবুজ গাছপালা সালোকসংশ্লেষের সময় কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্রহণ করে নিজেদের খাদ্য তৈরী করে। কিন্তু বনাঞ্চল ধ্বংসের ফলে গাছপালা কমে যাওয়ায় বাতাসে কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ দিনের পর দিন বেড়ে চলেছে।

ক্ষতিকারক প্রভাব : বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ বেড়ে গেলে, তা সৌরশক্তি শোষণ করে বায়ুমণ্ডলের তাপমাত্রা ক্রমশ বাড়িয়ে তোলে। একে গ্রীনহাউস এফেক্ট বা সবুজঘর প্রভাব বলে। বাতাসে CO_2 এর পরিমাণ বেড়ে গেলে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কমার এবং মাটির আর্দ্রতা লুপ্ত হবার সম্ভভাবনা বাড়ে। এছাড়া বাতাসে CO_2 এর পরিমাণ বাড়লে সমুদ্রের জলের অম্লতা বেড়ে যায়, ফলে সামুদ্রিক উদ্ভিদ ও প্রাণীকুলের ক্ষতি হয়।

3.2.3 সালফার ডাইঅক্সাইড

জীবাশ্ম জ্বালানী ও উচ্চ সালফারযুক্ত কয়লার দহনে, ধাতু নিষ্কাশনে, মোটরগাড়ির ধোঁয়া থেকে বাতাসে সালফার ডাইঅক্সাইড আসে। এছাড়া আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের সময় প্রচুর সালফার ডাইঅক্সাইড উৎপন্ন হয়।

ক্ষতিকারক প্রভাব : শ্বাসপ্রশ্বাসের সময় মানুষের শরীরে সালফার ডাইঅক্সাইড প্রবেশ করলে হাঁপানি, শ্বাসকষ্ট প্রভৃতি রোগ দেখা যায়।

বায়ুতে সালফার ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে শ্বাসনালীতে জ্বালার সৃষ্টি করে এবং ফুসফুসে ক্যান্সার হওয়ার সম্ভভাবনা থাকে। এছাড়া গাছপালা ও উদ্ভিদের পক্ষে অল্প পরিমাণে সালফার ডাইঅক্সাইড সহনযোগ্য কিন্তু বায়ুমণ্ডলে এর পরিমাণ বাড়লে জলের অম্লতা বৃদ্ধি পায়, ফলে

উদ্ভিদের বৃদ্ধি হ্রাস পায়। বেশীদিন ধরে সালফার ডাইঅক্সাইড পরিমণ্ডলে থাকলে উদ্ভিদের ক্লোরোফিল নষ্ট হয়, ফলে উদ্ভিদের খাদ্য উৎপাদন ক্ষমতা কমে যায়।

উদ্ভিদ ও প্রাণী ছাড়া সালফার ডাইঅক্সাইড ইট, কাঠ, লোহা, সিমেন্টের কাঠামো, মূর্তি এবং প্রাকৃতিক তন্তুর ক্ষতি করে। পৃথিবীর নানা অঞ্চলে বহু ঐতিহ্যবাহী অমূল্য মূর্তি, নিদর্শন যেমন ভারতের তাজমহল এই গ্যাসের ক্ষতিকারক প্রভাবের ফলে ধীরে ধীরে ক্ষয়ে যাচ্ছে।

3.2.4 নাইট্রোজেন অক্সাইড (NO_x)

নাইট্রোজেনের নানা অক্সাইড যেমন নাইট্রিক অক্সাইড (NO), নাইট্রাস অক্সাইড (N_2O), নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড (NO_2) প্রভৃতি অন্যতম দূষণকারী পদার্থ। এইগুলির মধ্যে নাইট্রিক অক্সাইডই হল প্রধান দূষক। কয়লা, তেল, গ্যাসোলিন প্রভৃতির দহনের ফলে নাইট্রোজেনের অক্সাইডগুলি সৃষ্টি হয়। এছাড়া বায়ুমণ্ডলের উচ্চ অংশে তড়িৎ মোক্ষণে, নাইট্রোজেন যৌগ দহনে, আগ্নেয়গিরি থেকে, নাইট্রিক অ্যাসিড উৎপাদন শিল্প থেকে প্রচুর পরিমাণে নাইট্রোজেন অক্সাইড উৎপন্ন হয়।

ক্ষতিকারক প্রভাব : বাতাসে নাইট্রিক অক্সাইডের পরিমাণ বেড়ে গেলে নিউমোনিয়া, শ্বাসকষ্ট, ফুসফুসে ক্যান্সার প্রভৃতি সমস্যার সৃষ্টি হয়। নাইট্রিক অক্সাইড রক্তের হিমোগ্লোবিনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে রক্তের অক্সিজেন বহন ক্ষমতা হ্রাস করে।

বেশী গাঢ়ত্বের নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড পাতার কোষ ধ্বংস করে, সালোকসংশ্লেষের হার কমায় এবং উদ্ভিদের বৃদ্ধি রোধ করে।

3.2.5 বস্তুকণা

প্রাকৃতিক উৎস যেমন আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত, টর্নেডো, সাইক্লোন দ্বারা পৃথিবী পৃষ্ঠের বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণা বাতাসে আসে। এছাড়া তাপবিদ্যুৎকেন্দ্র, ধাতু পরিশোধন কেন্দ্র থেকে প্রচুর পরিমাণে এরূপ কণিকা উৎপন্ন হয়। কৃষি ক্ষেত্রে ফসলের বর্জ্য পদার্থ দহনের ফলেও প্রচুর কণিকা বায়ুতে আসে। গ্যাসোলিনের দহনে উৎপন্ন টেট্রাইথাইল লেড, কয়লার দহনে উৎপন্ন সিলিকা, অ্যালুমিনা, কার্বন প্রভৃতি কণা বাতাসে দূষণ সৃষ্টি করে।

ক্ষতিকারক প্রভাব : বাতাসে উপস্থিত ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কণা শ্বাসনালীতে প্রবেশ করে ফুসফুস কোষের ক্ষতিসাধন করে। মোটরগাড়ির ধোঁয়া থেকে নির্গত সীসার কণা শ্বাসনালীর মাধ্যমে মানুষের

শরীরে প্রবেশ করে মস্তিষ্কে ব্যাপক ক্ষতি করে এবং স্নায়বিক বৈকল্য দেখা যায়। সীসার কণা রক্তের লোহিত কণিকার উৎপাদন কমায়। শ্বাসপ্রশ্বাসের সময় সিলিকা মানবদেহে প্রবেশ করলে দীর্ঘস্থায়ী সিলিকোসিস রোগ হয়।

নানাপ্রকার ধাতব কণা বৃষ্টির মাধ্যমে মাটিতে জমা হয় এবং মাটির উর্বরতা নষ্ট করে। ধুলি, ধোঁয়াশা প্রভৃতি কণা পাতার পত্ররন্ধ্র বন্ধ করে উদ্ভিদের CO_2 গ্রহণ ক্ষমতা হ্রাস করে ফলে সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়ার ব্যাঘাত ঘটে এবং উদ্ভিদের বৃদ্ধি কমে যায়।

3.2.6 বিষাক্ত ভারী উপাদান

জীবের পক্ষে ক্ষতিকারক ভারী উপাদানগুলি হল পারদ, সীসা, আর্সেনিক, ক্যাডমিয়াম প্রভৃতি। খননকার্যের মাধ্যমে বা অন্যান্য উপাদান পরিশোধনের মাধ্যমে এগুলির সৃষ্টি হয়।

ক্ষতিকারক প্রভাব : সামান্য পরিমাণে পারদবাষ্প প্রশ্বাসের মাধ্যমে গ্রহণ করলে স্নায়ুতন্ত্রের ক্ষতি হয়। আর্সেনিক গ্রহণ দীর্ঘস্থায়ী ক্যান্সার ও নানাধরনের চর্মরোগের সৃষ্টি করে।

অনুশীলনী—1

(a) বায়ুর তিনটি দূষণকারী উপাদানের নাম করুন।

(b) বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার মতে বায়ুদূষণের সংজ্ঞা দিন।

(c) কার্বন মনোক্সাইড কীভাবে মানুষের ক্ষতি করে?

(d) নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড থেকে বৃষ্টিতে কী গ্যাস সঞ্চারিত হয়? বিক্রিয়া দিন।

(e) বাতাসে থাকতে পারে ও ক্যান্সার ঘটায়, এমন বস্তুকণার নাম করুন।

(f) সিলিকোসিস্ রোগ কীসের থেকে ঘটে?

3.3 সবুজঘর বা গ্রীনহাউস প্রভাব

3.3.1 সবুজঘর বা গ্রীনহাউস কী?

সবুজঘর হল কাচের তৈরী একটি আবদ্ধ ঘর যার মধ্যে নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় সবুজ গাছপালার চাষ করা হয়। এই ঘরের কাচের মধ্য দিয়ে সূর্যের দৃশ্য আলোকরশ্মি ঘরের মধ্যে প্রবেশ করে উদ্ভিদ ও মাটিকে উত্তপ্ত করে। উত্তপ্ত মাটি দীর্ঘতর তরঙ্গদৈর্ঘ্যের অতিলোহিত রশ্মি বিকিরণ করে, কিন্তু এই রশ্মি কাচ ভেদ করে বাইরে আসতে পারে না। ফলে ঘরের মধ্যের তাপমাত্রা বাইরের তাপমাত্রা থেকে বেশী থাকে। এই সবুজঘরের সাথে প্রকৃতির সবুজ ঘরের তুলনা করা হয়।

সবুজঘর প্রভাব বা প্রকৃতির সবুজ কাকে বলে? বায়ুমণ্ডলে উপস্থিত CO_2, CO, N_2 প্রভৃতি গ্যাসের পরিমাণের উপর পৃথিবীর তাপমাত্রার ভারসাম্য নির্ভর করে। পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে যে CO_2, জলীয় বাষ্পের স্তর আছে তা গ্রীনহাউসের কাঁচের মতো আচরণ করে। মহাশূন্য থেকে আগত সূর্যরশ্মি পৃথিবী-পৃষ্ঠে এসে পড়ে কিন্তু পৃথিবী-পৃষ্ঠ থেকে প্রতিফলিত রশ্মি বায়ুমণ্ডলে উপস্থিত CO_2, জলীয় বাষ্প দ্বারা শোষিত হয় ফলে পৃথিবীর তাপমাত্রা বাড়ে। এই ঘটনাকে সবুজঘর প্রভাব বলে।

3.3.2 সবুজঘরের প্রভাবগুলি কী কী?

তাপমাত্রা বৃদ্ধি : কার্বন ডাইঅক্সাইড, জলীয় বাষ্প ও অন্যান্য গ্যাসসমূহ পৃথিবী-পৃষ্ঠ থেকে প্রতিফলিত সূর্যের অবলোহিত রশ্মি মহাশূন্যে বিকীর্ণ হতে দেয় না। ফলে ভূ-পৃষ্ঠের তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়।

সমুদ্রের জলতলের উচ্চতা বৃদ্ধি : পৃথিবীর তাপমাত্রা 2-4°C বৃদ্ধি পেলে মেরু অঞ্চলের বরফ গলতে শুরু করবে। ফলে সমুদ্রের জলতলের উচ্চতা বৃদ্ধি পাবে এবং সমুদ্রতীরবর্তী দেশ জলমগ্ন হবে।

জলচক্রের পরিবর্তন : পৃথিবীর তাপমাত্রা বাড়ার সাথে সাথে ভূ-পৃষ্ঠস্থ জলের বাষ্পীভবন বৃদ্ধি পাবে এবং পৃথিবীর মাটি শুকিয়ে যাবে। এর ফলে গরমকালে গরম বাড়বে এবং বর্ষাকালে বৃষ্টি ও বন্যা বেশী হবে। এইভাবে পৃথিবীর জলচক্রের পরিবর্তন হবে।

স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব : পৃথিবীর তাপমাত্রা বাড়লে বিভিন্ন ধরনের রোগ যেমন ম্যালেরিয়া, ডেঙ্গু প্রকৃতির প্রাদুর্ভাব বাড়বে। হাঁপানি ও অ্যালার্জি জাতীয় রোগ বাড়বে।

বাস্তুতন্ত্রের উপর প্রভাব : উদ্ভিদ ও প্রাণীকুলের জীবনধারণের জন্য পৃথিবীর তাপমাত্রার একটি বিশেষ ভূমিকা আছে। সবুজঘরের প্রভাবে পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে উদ্ভিদ ও প্রাণীকুল ধ্বংস হয়ে যাবে। তাপমাত্রা বৃদ্ধি পেলে কৃষিপণ্যের উৎপাদন হ্রাস পাবে, জৈবিক উপাদানও হ্রাস পাবে।

3.3.3 সবুজঘর গ্যাসসমূহ এবং তাদের উৎস

কার্বন ডাইঅক্সাইড : সবুজঘর প্রভাবের জন্য কার্বন ডাইঅক্সাইডের ভূমিকা সর্বাধিক। বনাঞ্চল ধ্বংস হওয়ার ফলে বায়ুমণ্ডলে CO_2-এর পরিমাণ দিনে দিনে বাড়ছে। কয়লা, পেট্রোলিয়াম প্রভৃতির

দহনের ফলে CO_2 গ্যাস উৎপন্ন হয়। মোটারগাড়ি, রেলগাড়ি প্রভৃতিতে ডিজেল এবং গ্যাসোলিনের দহনের ফলেও প্রচুর পরিমাণে CO_2 তৈরী হয়।

মিথেন : পৃথিবী-পৃষ্ঠের তাপমাত্রা বৃদ্ধির জন্য CO_2-এর পর মিথেন (CH_4)-এর স্থান। মিথেন গ্যাসের প্রধান উৎস হল গবাদি পশুপালন কেন্দ্র। ধানক্ষেত, গরু, ঘোড়া প্রভৃতি গৃহপালিত পশুর বর্জ্যপদার্থ থেকে বায়ুমণ্ডলে মিথেন গ্যাস আসে। তেল এবং কয়লাখনি থেকেও মিথেন গ্যাস নির্গত হয়।

নাইট্রাস অক্সাইড : নাইট্রোজেন ঘটিত সার, দূষিত জল বিশুদ্ধীকরণ প্রক্রিয়া থেকে, গাছপালার দহনে, কলকারখানার ধোঁয়া থেকে বাতাসে নাইট্রাস অক্সাইড আসে।

উদ্বায়ী জৈব রাসায়নিক পদার্থ : রঙশিল্প, শুষ্ক ধৌতায়ন প্রক্রিয়া, প্রসাধনী শিল্প থেকে প্রচুর পরিমাণে জৈব রাসায়নিক পদার্থ তৈরী হয়।

3.3.4 সবুজঘর প্রভাব নিয়ন্ত্রণ

কয়লা, পেট্রোলিয়াম প্রভৃতি জ্বালানীর ব্যবহার কমিয়ে সৌরশক্তির ব্যবহার বৃদ্ধি করে সবুজঘর প্রভাব নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভভব। ব্যাপক পরিমাণে বৃক্ষ রোপণ প্রয়োজন কারণ সবুজ গাছপালা সালোকসংশ্লেষের সময় CO_2 গ্যাস গ্রহণ করে, ফলে CO_2-এর সবুজঘর প্রভাব অনেকটা কমে।

3.4 অম্লবৃষ্টি

বৃষ্টির জলে সালফিউরিক, নাইট্রিক, হাইড্রোক্লোরিক প্রভৃতি অ্যাসিড মিশ্রিত থাকলে তাকে অম্লবৃষ্টি বলে। বাতাসে উপস্থিত SO_2, NO_2 প্রভৃতি গ্যাস জলের সাথে বিক্রিয়া করে সালফিউরাস অ্যাসিড (H_2SO_3), সালফিউরিক অ্যাসিড (H_2SO_4), নাইট্রিক অ্যাসিড (HNO_3), নাইট্রাস অ্যাসিড (HNO_2) প্রভৃতি তৈরী করে। এই সকল অ্যাসিড বৃষ্টির সাথে মাটিতে এসে পড়ে।

3.4.1 অম্লবৃষ্টির উৎস

সালফার ডাইঅক্সাইড : সালফার ঘটিত আকরিকের বায়ুতে তাপ জারণের ফলে, সালফার ঘটিত খনিজ তেলের দহনের ফলে প্রচুর পরিমাণে SO_2 উৎপন্ন হয়। বাতাসের O_2-এর সাথে

SO_2-এর বিক্রিয়ায় SO_3 উৎপন্ন হয়, যাহা বৃষ্টির জলের সাথে মিশে সালফিউরিক অ্যাসিড উৎপন্ন করে।

$$2SO_2 + O_2 \rightarrow 2SO_3$$

$$SO_3 + H_2O \rightarrow H_2SO_4$$

নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড : বিদ্যুৎক্ষরণের সময় বায়ুতে উপস্থিত N_2 এবং O_2 পরস্পর যুক্ত হয়ে নাইট্রিক অক্সাইড NO উৎপন্ন হয়। উৎপন্ন NO বাতাসের অক্সিজেনের সাথে বিক্রিয়া করে নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড তৈরী করে।

$$N_2 + O_2 \xrightarrow{\text{বিদ্যুৎক্ষরণ}} 2NO$$

$$2NO + O_2 \rightarrow 2NO_2$$

নাইট্রিক অ্যাসিড উৎপাদন শিল্পেও প্রচুর পরিমাণে নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড উৎপন্ন হয় এবং বাতাসে মেশে। বৃষ্টির জলের সাথে এর বিক্রিয়ায় নাইট্রিক অ্যাসিড ও নাইট্রাস অ্যাসিড উৎপন্ন হয় এবং তা বৃষ্টির জলের সাথে মাটিতে এসে পড়ে।

$$2NO_2 + H_2O \rightarrow HNO_3 + HNO_2$$

3.4.2 অম্লবৃষ্টির প্রভাব

জলজ প্রাণী ও উদ্ভিদের উপর প্রভাব : জলজ উদ্ভিদ ও প্রাণী জলের নির্দিষ্ট pH মানের (এই pH-এর মান 5.6) উপর নির্ভর করে বেঁচে থাকে। অম্লবৃষ্টির ফলে পুকুর, নদী প্রভৃতি জলের pH-এর মান কমে যায়। এর ফলে জলজ প্রাণী ও উদ্ভিদের উৎপাদন কমে। অম্লবৃষ্টির প্রভাবে মাটির আম্লিকতা বাড়ে ফলে উদ্ভিদের সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়া ব্যাঘাত ঘটে এবং উদ্ভিদের বৃদ্ধি কমে যায়। অম্লবৃষ্টির ফলে নদী তীরবর্তী মাটিতে উপস্থিত অ্যালুমিনিয়াম, তামা, পারদ, সীসাঘটিত যৌগ দ্রবীভূত হয়ে নদীতে এসে পড়ে এবং নদীর জলকে বিষাক্ত করে। এই বিষাক্ত জল গ্রহণ করে জলজ প্রাণী ও উদ্ভিদের জীবনহানি ঘটে। নদীর জলের অম্লত্বের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে মৃত প্রাণী ও উদ্ভিদের জৈব রাসায়নিক বিভাজন কমে যায় ফলে মাছের উৎপাদনের জন্য প্রয়োজনীয় নাইট্রোজেন, ফসফরাস প্রভৃতির পরিমাণ কমে যায়।

মাটির উপর প্রভাব : মাটিতে অম্লের পরিমাণ বাড়ার ফলে উদ্ভিদের শিকড়ে উপস্থিত নাইট্রোজেন আত্তীকারক জীবাণুসমূহের কর্মক্ষমতা কমে যায় ফলে মাটির উর্বরতা নষ্ট হয়, মাটির মধ্যে বসবাসকারী বিভিন্ন প্রাণী ও জীবাণুরা ক্ষতিগ্রস্থ হয়। অম্লবৃষ্টির ফলে মাটি থেকে প্রয়োজনীয়

ধাতু Mg, K প্রভৃতি দূরীভূত হয় ও দূষণকারী ধাতু Al, Pb, Cu জমা হয়, ফলে উদ্ভিদের মৃত্যুও ঘটে থাকে।

মানুষের উপর প্রভাব : অম্লবৃষ্টির ফলে মাটিতে উপস্থিত দূষিত কণিকা জলবাহিত হয়ে নদীর জলে মেশে। এই বিষাক্ত জল গ্রহণ করে পেটের অসুখ (বিশেষ করে আন্ত্রিক ক্ষত), মানসিক ভারসাম্যহীনতা, হৃৎপিণ্ড সম্ভবন্ধীয় নানা জটিল রোগের সৃষ্টি হয়। অম্লবৃষ্টির ফলে মানুষের ত্বক ও চুলের ক্ষতি হয়।

3.4.3 অম্লবৃষ্টি নিয়ন্ত্রণ

অম্লবৃষ্টি সৃষ্টির প্রধান উৎস যেমন SO_2, NO_2 প্রভৃতি গ্যাসের উৎপাদন নিয়ন্ত্রণ করা দরকার। কম সালফারযুক্ত জ্বালানী তেল ব্যবহার করে বা বিকল্প শক্তি যেমন সৌরশক্তি, বায়ুশক্তি প্রভৃতি ব্যবহার করে SO_2-এর পরিমাণ কমানো যায়। যে সকল শিল্পে প্রচুর পরিমাণে SO_2, NO_2 প্রভৃতি গ্যাস উৎপন্ন হয়, সেখানে উৎপন্ন গ্যাস ক্ষারীয় দ্রবণ বা প্রলম্ভবন যেমন KOH, CaO, MgO প্রভৃতির মধ্য দিয়ে অতিক্রম করালে আম্লিক গ্যাসগুলি শোষিত হয়ে যায়। ফলে বায়ুতে SO_2, NO_2-এর পরিমাণ কমে।

3.5 ধোঁয়াশা

জীবাশ্ম জ্বালানীর দহনের ফলে, গাড়ির ধোঁয়া ও অন্যান্য প্রক্রিয়া থেকে উৎপন্ন নাইট্রোজেন অক্সাইড, CO, অসম্পৃক্ত হাইড্রোকার্বনসমূহ প্রভৃতি সূর্যালোকের প্রভাবে আলোক-রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় ধোঁয়াশার সৃষ্টি করে। ধোঁয়াশার সঙ্গে সালফার ডাইঅক্সাইড, নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড, কার্বন মনোক্সাইড, ওজোন প্রভৃতি বায়ুদূষণকারী গ্যাস এবং সীসা, তামার গুঁড়ো, ধুলিকণা প্রভৃতি কঠিন ও তরল কণিকা মিশ্রিত থাকলে ধোঁয়াশা বিষাক্ত হয়ে ওঠে।

3.5.1 কেন ধোঁয়াশার সৃষ্টি হয়

ভূ-পৃষ্ঠ থেকে 10 কিমি উচ্চতা পর্যন্ত বায়ুতে CO_2, SO_2, NO_2 প্রভৃতি গ্যাসের পরিমাণ বেশী থাকলে সূর্যের আলো ভূ-পৃষ্ঠে পতিত হওয়ার আগেই এই সকল গ্যাস দ্বারা শোষিত হয়। ফলে উষ্ণতার বিপরীতক্রম হয় অর্থাৎ ভূ-পৃষ্ঠ ঠাণ্ডা থাকে এবং উপরের বায়ুস্তর গরম থাকে। এইজন্য ভূ-পৃষ্ঠে সৃষ্ট ধোঁয়া, ধুলিকণা প্রভৃতি উপরে উঠতে পারে না। এই ফলে ভূ-পৃষ্ঠ সংলগ্ন বায়ুতে ধোঁয়াশার সৃষ্টি হয়।

3.5.2 ধোঁয়াশার প্রকারভেদ

দূষিত গ্যাস ও অন্যান্য ভাসমান কণার উপস্থিতির উপর ধোঁয়াশাকে তিন ভাগে ভাগ করা যায়।

আলোক-রাসায়নিক ধোঁয়াশা : বায়ুতে প্রচুর পরিমাণে NO_2, হাইড্রোকার্বন উপস্থিত থাকলে সূর্যের আলোর প্রভাবে ওজোন এবং জৈব পার-অক্সাইড উৎপন্ন হয়। এই ওজোন, জৈব পার-অক্সাইড, ধূলিকণা প্রভৃতি বাতাসকে বিষাক্ত করে তোলে।

সালফিউরাস ধোঁয়াশা : বাতাসে সালফার ডাইঅক্সাইড, সালফিউরিক অ্যাসিডকণা প্রভৃতির সঙ্গে স্থির বাতাস, তাপমাত্রার বিপরীতক্রম ও ঘন কুয়াশা থাকলে সালফিউরাস ধোঁয়াশার সৃষ্টি হয়।

ধূলিকণা ধোঁয়াশা : খনিজ তেলের দহন, তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে উৎপন্ন 0.1 মাইক্রন ব্যাসের ছোট ছোট ধূলিকণা যে ধোঁয়াশার সৃষ্টি করে, তাকে ধূলিকণা ধোঁয়াশা বলে। সাধারণতঃ শীতকালে এরকম ধোঁয়াশা দেখা যায়।

3.5.3 ধোঁয়াশার প্রভাব

মানুষের উপর : ধোঁয়াশার উপস্থিত O_3 গ্যাস সর্দিকাশি ও ব্রঙ্কাইটিস্ বাড়ায়। ফুসফুসের কর্মদক্ষতা নষ্ট করে। ধোঁয়াশার জারক পদার্থের পরিমাণ বেশী থাকলে মানুষের বুকের অসুখ দেখা যায়।

উদ্ভিদের উপর : ধোঁয়াশা গাছের সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়া ব্যাহত করে, পাতার উপর সাদা দাগের সৃষ্টি করে, শস্য বিনষ্ট করে।

3.6 ওজোন স্তর

ওজোন হল আঁশটে গন্ধযুক্ত হালকা নীল বর্ণের একটি গ্যাস। এটি অক্সিজেনের একটি রূপভেদ। বাতাসের সকল উচ্চতায় কমবেশি পরিমাণ ওজোন বর্তমান। সমগ্র বায়ুমণ্ডলের 90 শতাংশ ওজোন স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারের নিম্নাঞ্চল অর্থাৎ 20-35 কিলোমিটারের মধ্যে থাকে। এই স্তরকে ওজোনোস্ফিয়ার বলে।

3.6.1 বায়ুমণ্ডলে ওজোন স্তরের সৃষ্টি

আলোক-রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে বায়ুমণ্ডলের স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার অঞ্চলে ওজোন উৎপন্ন হয়। স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার অঞ্চলে বায়ুর অক্সিজেন সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মি শোষণ করে অক্সিজেন পরমাণুতে পরিণত হয়।

$$O_2 \xrightarrow[\text{অতিবেগুনি রশ্মি}]{\text{সূর্যের}} 2O \quad .....(1)$$

এই অক্সিজেন পরমাণু আণবিক অক্সিজেনের সাথে যুক্ত হয়ে ওজোনে পরিণত হয়।

$$O_2 + O \xrightarrow{O_2^* \text{ বা } N_2^*} O_3 + (O_2 \text{ বা } N_2) \text{ (শোষিত শক্তি সম্পন্ন অণু)} .....(2)$$

2 নং বিক্রিয়ায় O_2 বা N_2 থাকা প্রয়োজন, এটি বিক্রিয়াজাত শক্তি শোষণ করে এবং ওজোনকে স্থায়ী করে। এভাবে উৎপন্ন ওজোন সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মি শোষণ করে ধ্বংস হয়ে যায়।

$$O_3 \xrightarrow[\text{অতিবেগুনি রশ্মি}]{\text{সূর্যের}} O_2 + O \quad .....(3)$$

$$O_3 + O \rightarrow 2O_2 \quad ..... \quad (4)$$

বায়ুমণ্ডলে এইভাবে ওজোন সর্বক্ষণ তৈরী হচ্ছে এবং বিযোজিত হচ্ছে, ফলে ওজোনের সাম্যাবস্থা বজায় থাকে। এই ওজোন স্তরের প্রধান ভূমিকা হল মহাশূন্য থেকে আগত ক্ষতিকারক অতিবেগুনি রশ্মি শোষণ করা। এখন সাম্যাবস্থায় থাকা ওজোনের পরিমাণ কমে গেলে সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মি সরাসরি ভূ-পৃষ্ঠে চলে আসবে এবং উদ্ভিদ ও প্রাণীর জীবন নষ্ট হবে।

3.6.2 ওজোন স্তরের বিনষ্টি

ক্লোরিন তত্ত্ব : ক্লোরোফ্লুওরোকার্বন শীতলকারক বস্তু হিসাবে রেফ্রিজারেটারে, শীততাপ নিয়ন্ত্রিত যন্ত্রে এবং এরোসোল তৈরীতে ব্যবহার করা হয়। কার্বন, ফ্লুওরিন এবং ক্লোরিন-ঘটিত যৌগগুলিকে ক্লোরোফ্লুওরোকার্বন বলে। এই যৌগসমূহ সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মির দ্বারা বিনষ্ট হয়ে ক্লোরিন পরমাণু (মুক্ত মূলক) উৎপন্ন করে। এই ক্লোরিন পরমাণু ওজোন অণুকে ভাঙতে অনুঘটক হিসাবে কাজ করে।

$$CFCl_3\ (g) \xrightarrow[\text{অতিবেগুনি রশ্মি}]{\text{সূর্যের}} CFCl_2 + Cl(g)$$

$$O_3 + Cl \rightarrow ClO + O_2$$

$$ClO + O \rightarrow Cl + O_2$$

মুক্ত Cl পরমাণু পুনরায় ওজোনকে অক্সিজেন অণুতে পরিবর্তিত করে। এই প্রক্রিয়া চলতে থাকে এবং একটি ক্লোরিন পরমাণু নিষ্ক্রিয় হওয়ার আগে হাজার হাজার ওজোন অণুকে ধ্বংস করে।

নাইট্রোজেন অক্সাইড তত্ত্ব : কৃষিকাজে রাসায়নিক সার হিসাবে প্রচুর পরিমাণে নাইট্রোজেনঘটিত যৌগ ব্যবহৃত হয়। প্রচুর রাসায়নিক সার ব্যবহারের ফলে, জীবাণু দ্বারা উৎপন্ন নাইট্রাস অক্সাইড বাতাসে নাইট্রোজেন এবং নাইট্রিক অক্সাইডে বিশ্লিষ্ট হয়। সার ব্যতীত বাতাসে নাইট্রোজেন অক্সাইডসমূহের উৎস হল অতিস্রব বিমানসমূহ, এই বিমানে জ্বালানীর দহনের ফলে প্রচুর পরিমাণ NO_x স্ট্র্যাটোস্ফিয়ারে ছড়িয়ে পড়ে। এই নাইট্রোজেন অক্সাইডসমূহ ওজোনকে ধ্বংস করে।

$$NO + O_3 \rightarrow NO_2 + O_2$$

$$NO + O_2 \rightarrow NO_2 + O$$

$$NO_2 + O_3 \rightarrow NO_3 + O_2$$

$$NO_2 + O \rightarrow NO + O_2$$

NO_3, NO_2 প্রভৃতি মূলক অত্যন্ত সক্রিয় এবং এদের অর্ধায়ুকাল দীর্ঘ হওয়ার ফলে ওজোন বিশ্লিষ্ট হওয়ার হার বৃদ্ধি পায়। এই ক্রিয়া অনির্দিষ্টকাল পর্যন্ত চলতে থাকে এবং ওজোন অণুর সংখ্যা কমতে থাকে।

3.6.3 ওজোন স্তর ক্ষয়ের প্রভাব

মানুষের উপর : ওজোন স্তরে ওজোনের পরিমাণ কমে গেলে সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মি সরাসরি ভূপৃষ্ঠে আপতিত হবে, ফলে ভূপৃষ্ঠের তাপমাত্রা বাড়বে এবং ত্বকের ক্যানসারও বাড়বে।

সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মিতে শরীর বেশীদিন উন্মুক্ত থাকলে মানুষের স্বাভাবিক রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা কমে যাবে, শারীরিক বৃদ্ধি ও মানসিক বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হবে।

উদ্ভিদের উপর : সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মি ভূপৃষ্ঠে আপতিত হওয়ার জন্য উদ্ভিদের সালোকসংশ্লেষ প্রক্রিয়া কমবে এবং শস্যের উৎপাদন কম হবে। ভূপৃষ্ঠের তাপমাত্রা বৃদ্ধির জন্য মাটির আর্দ্রতা কমবে, কৃষিক্ষেত্রে উৎপাদন কমবে।

3.6.4 ওজোন স্তর রক্ষা

ওজোন স্তর ধ্বংসকারী ক্লোরোফ্লুওরোকার্বনের ব্যবহার কমিয়ে ওজোন স্তর রক্ষা করা যায়। বর্তমানে ক্লোরোফ্লুওরোকার্বনের পরিবর্তে ফ্লুওরোকার্বন ব্যবহৃত হচ্ছে কারণ এদের থেকে ক্লোরিন মূলক নির্গত হবার সম্ভভাবনা নেই, আর তাই ওজোন স্তরের বিনষ্টিও হ্রাস পাবে।

3.7 বায়ুদূষণের কয়েকটি ঘটনা

1930 সালের ডিসেম্ভর মাসে বেলজিয়ামের মিউস্ উপত্যকায় বিষাক্ত সালফিউরাস ধোঁয়াশায় 63 জন মানুষ প্রাণ হারিয়েছিলেন এবং প্রায় 600 মানুষ অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন।

1952 সালের ডিসেম্ভর মাসে লন্ডনে ধোঁয়াশার প্রভাবে প্রায় 4000 লোকের মৃত্যু হয়।

1984 সালের ডিসেম্ভর মাসে ভারতে মধ্যপ্রদেশের ভোপাল শহরে ইউনিয়ন কার্বাইডের কীটনাশক তৈরীর কারখানা থেকে বিষাক্ত গ্যাস মিথাইল আইসোসায়ানেটের নির্গমনের ফলে প্রায় পাঁচ হাজারের বেশী লোকের মৃত্যু হয়।

1995 সালে গরমকালে চিকাগো শহরে সবুজঘরের প্রভাবে প্রায় 465 জন মানুষ প্রাণ হারান।

1986 সালে অম্লবৃষ্টির ফলে ইউরোপের প্রায় 30 হাজার মিলিয়ন হেক্টর বনাঞ্চল ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

3.8 বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ

বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ করার প্রধান উপায় হল দূষণ সৃষ্টিকারী পদার্থগুলির ব্যবহার কমানো এবং তাদের উৎপাদন রোধ করা। বড় বড় শহরে যেখানে অসংখ্য যানবাহন চলাচল করে এবং প্রচুর কলকারখানা আছে সেখানে বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ করা সবচেয়ে জরুরী। বায়ুদূষণ নিয়ন্ত্রণ করার কয়েকটি পদ্ধতি নীচে আলোচনা করা হল।

যানবাহন থেকে নির্গত দূষিত গ্যাসসমূহকে প্রথমে উঁচু তাপমাত্রায় প্লাটিনাম, প্যালাডিয়াম প্রভৃতি অনুঘটকের মধ্য দিয়ে পাঠাতে হবে। এর ফলে গ্যাস মিশ্রণে উপস্থিত কার্বন মনোক্সাইডের দ্বারা নাইট্রোজেন অক্সাইডসমূহ বিজারিত হয়ে নাইট্রোজেন ও অ্যামোনিয়ায় পরিণত হয়। এরপর গ্যাসসমূহকে অতিরিক্ত বাতাসের উপস্থিতিতে নিকেল, আয়রণ বা ম্যাঙ্গানীজ-এর অক্সাইডের মধ্য দিয়ে পাঠাতে হবে। এর ফলে গ্যাস মিশ্রণে উপস্থিত কার্বন মনোক্সাইড এবং অন্যান্য হাইড্রোকার্বনগুলো কার্বন ডাইঅক্সাইড ও জলীয় বাষ্পে পরিণত হয়ে বাতাসে মিশে যাবে।

সালফার ডাইঅক্সাইডের দূষণ থেকে রক্ষা পাওয়ার প্রধান উপায় হল সালফারমুক্ত জ্বালানী ব্যবহার করা। এছাড়া জ্বালানীর দহনের ফলে উৎপন্ন গ্যাসকে সক্রিয় চারকোল, তরল অ্যামোনিয়া, চুনজলের দ্রবণের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করিয়েও সালফার ডাইঅক্সাইড ও অন্যান্য দূষিত গ্যাস শোষণ করা যায়।

গৃহস্থালী ও কলকারখানায় কয়লা, কাঠ প্রভৃতি জ্বালানীর ব্যবহারের পরিবর্তে তড়িৎশক্তি, সৌরশক্তি ইত্যাদির ব্যবহার বাড়িয়ে দূষণ রোধ করা যায়।

প্রচুর পরিমাণে বৃক্ষ রোপণ করেও বায়ুদূষণ রোধ করা যায়। কারণ উদ্ভিদ বায়ুতে উপস্থিত হাইড্রোজেন সালফাইড, নাইট্রিক অ্যাসিডবাষ্প, কার্বন ডাইঅক্সাইড শোষণ করে এবং বাতাসে অক্সিজেন সরবরাহ করে।

প্রযুক্তিবিদ্যার অগ্রগতির ফলে পরমাণু চুল্লীর আবর্জনা নিয়ন্ত্রণ ফলপ্রসূ হয়েছে। এর ফলে বাতাসে তেজস্ক্রিয়তার প্রভাব কমবে।

প্রতিবছর 4ঠা জুন বিশ্ব পরিবেশ দিবস পালিত হচ্ছে। বেতার, দূরদর্শন এবং সংবাদপত্রে পরিবেশদূষণ সম্পর্কে সতর্কবার্তা প্রচারিত হচ্ছে। মানুষ ও অন্যান্য জীবের জীবনধারাকে সুস্থ এবং স্বাভাবিক করতে হলে দূষণ মুক্তির কোনো বিকল্প নেই। এই কথাটি তুললে পৃথিবী একদিন বসবাসের অযোগ্য হয়ে উঠবে।

আবার এটাও ঠিক যে দূষণ সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে অঙ্গাঙ্গিভাবে যুক্ত, তাই একে সম্পূর্ণ বন্ধ করা অসম্ভব। তবে হ্যাঁ, একে ন্যূনতম মাত্রায় নামিয়ে আনার চেষ্টা করা প্রয়োজন। পৃথিবী জুড়ে সে চেষ্টা হচ্ছে, এবং আমাদের অস্তিত্বের স্বার্থে সে চেষ্টা অব্যাহত রাখা উচিত।

অনুশীলনী—2

(a) তিনটি গ্রীনহাউস গ্যাসের নাম করুন।

(b) ক্লোরোফ্লুওরোকার্বনের পরিবর্তে আজকাল কোন্ রাসায়নিক ব্যবহৃত হয়? কেন?

(c) PAN-এর পুরো নাম কী?

(d) তাজমহলের বাইরের ঔজ্জ্বল্য নষ্ট হচ্ছে কীভাবে?

(e) বায়ুমণ্ডলে ওজোন কীভাবে উৎপন্ন হয়?

3.9 সারাংশ

- বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার মতে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের মধ্যে ক্ষতিকারক পদার্থসমূহের ঘন-সন্নিবেশ যখন মানুষ ও তার পারিপার্শ্বিকের পক্ষে ক্ষতিকারক হয়ে ওঠে, তখন তাকে বায়ুদূষণ বলে

- সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে দূষণের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। তাই দূষণ একেবারে বন্ধ করা সম্ভব নয়, তবে একে ন্যূনতম মানে রাখার চেষ্টা জীবমণ্ডলের অস্তিত্বের স্বার্থেই প্রয়োজন
- বায়ুদূষণের উৎসসমূহ হল : (i) প্রাকৃতিক—আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত, ছত্রাকসমূহ, দাবানল, ধূলা ও মাটির কণা; (ii) অপ্রাকৃতিক—কলকারখানা, ধোঁয়া, বিষাক্ত গ্যাসসমূহ, তেজস্ক্রিয় কণা ও রশ্মি, পৌর আবর্জনা ইত্যাদি
- বায়ুমণ্ডলের গ্যাসীয় দূষণকারী পদার্থের 60%ই কার্বন মনোক্সাইড। এটি রক্তের সঙ্গে সুস্থিত জটিল যৌগ উৎপন্ন করে। তাই রক্তের অক্সিজেন গ্রহণ ও পরিবহণ ক্ষমতা কমে যায়
- কার্বন ডাইঅক্সাইড আসে প্রধানতঃ দহন ও শ্বসনের ফলে। এর জন্য সবুজঘর প্রভাবে পরিবেশের তাপমাত্রা বাড়ে ও জলের অম্লতা বাড়ে
- সালফার ডাইঅক্সাইড আসে সালফারযুক্ত জ্বালানীর দহনে ও অগ্ন্যুৎপাতের ফলে। এর প্রভাবে ফুসফুসের রোগ এমন কি ক্যান্সারও হতে পারে। অম্লবৃষ্টি সৃষ্টিতেও এর ভূমিকা আছে
- নাইট্রোজেন অক্সাইডসমূহ আসে বিভিন্ন জ্বালানীর দহনে, শিল্পক্ষেত্র থেকে বায়ুতে তড়িৎ মোক্ষণের ফলে। এর প্রভাবে ফুসফুসের রোগ ও অম্লবৃষ্টি ঘটে, উদ্ভিদের বৃদ্ধি রুদ্ধ হয়
- ঝড়, অগ্ন্যুৎপাত, শিল্পক্ষেত্র, খনি ইত্যাদি থেকে বস্তুকণা বায়ুমণ্ডলে আসে। এতে চর্মরোগ, স্নায়বিক রোগ ও ফুসফুসের ক্ষতি হয়, অনেক সময় এই ক্ষতি প্রাণান্তকর হয়ে ওঠে
- সবুজঘর প্রভাব প্রাকৃতিক বায়ুদূষণের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। বাতাসে CO_2, CO, N_2, জলীয় বাষ্প প্রভৃতি অন্তরক পদার্থের ঘটিত বেষ্টনী এর জন্য দায়ী। এর প্রভাবে তাপমাত্রা বৃদ্ধি পায়, জলতলের উচ্চতা বৃদ্ধি পায়, জলচক্রের পরিবর্তন ঘটে এবং তার ফলে জীবমণ্ডলী ক্ষতিগ্রস্ত হয়। সৌরশক্তির ব্যবহার বাড়িয়ে এ সমস্যার নিয়ন্ত্রণ সম্ভব
- অম্লবৃষ্টি ঘটে বৃষ্টির জলে অম্ল (H_2SO_4, HNO_3, HCl ইত্যাদি)-র উপস্থিতিতে। এর প্রভাবে শস্য উৎপাদনে বিঘ্ন ঘটে, সৌধাবলি ক্ষতিগ্রস্থ হয়, বাস্তুতন্ত্রের ধর্মের পরিবর্তন হয়, মানুষ ও অন্যান্য জীবের মধ্যে নানা রোগের প্রাদুর্ভাব দেখা যায়

- জীবাশ্ম জ্বালানী, গাড়ির ধোঁয়া ও বিভিন্ন গ্যাসের মধ্যে সূর্যালোকের প্রভাবে আলোক-রাসায়নিক বিক্রিয়ায় ধোঁয়াশা সৃষ্টি হয়। ধূলিকণা ও সালফার যৌগসমূহও এতে অংশগ্রহণ করে। এর প্রভাবে প্রাণীদের নানারকম রোগ হয়, উদ্ভিদও রোগগ্রস্থ হয় এবং শস্যহানি ঘটে
- বায়ুমণ্ডলের স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার অঞ্চলে সূর্যের থেকে আগত অতিবেগুনি রশ্মির প্রভাবে অক্সিজেন তার রূপভেদ ওজোনে পরিণত হয়। এই ওজোন স্তর অতিবেগুনি রশ্মি প্রতিহত করে। শীতক গ্যাস বা এরোসোলের অন্যতম উপাদান হিসাবে ব্যবহৃত ক্লোরোফ্লুওরোকার্বনের বিয়োজন থেকে উদ্ভুত ক্লোরিন মুক্ত মূলক ওজোনকে ক্ষয় করে ওজোন স্তরে গর্ত করে ফেলে। এর মধ্য দিয়ে সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মি পৃথিবীপৃষ্ঠে অবাধে প্রবেশ করে বাস্তুতন্ত্রের উপর ক্ষতিকর প্রভাব ফেলে। ক্লোরিনঘটিত যৌগের ব্যবহার বন্ধ করে এ সমস্যার সমাধান সম্ভভব
- বায়ুদূষণের ফলে একাধিক ক্ষেত্রে বিভিন্ন লোকালয়ের ব্যাপক ক্ষতি হয়েছে। 1930 সালে বেলজিয়ামের মিউস্ উপত্যকায়, 1952 সালে লন্ডনে, 1984-তে ভারতবর্ষের ভোপালে, 1986-তে ইউরোপের বনাঞ্চলে ও 1995-এ আমেরিকার চিকাগো শহরে উল্লেখ্য ব্যাপক ক্ষতির ইতিহাস হয়ে আছে
- সারা পৃথিবী জুড়ে বায়ুদূষণ কমাতে প্রচেষ্টা চালিয়ে চলেছেন বিজ্ঞানী ও পরিবেশবিদ্‌রা। ভারতবর্ষও পিছিয়ে নেই।

3.10 সর্বশেষ প্রশ্নাবলি

1. বায়ুদূষণ কাকে বলে?
2. বায়ুর প্রধান প্রধান দূষণকারী পদার্থগুলির নাম করুন।
3. বায়ুমণ্ডলে কার্বন মনোক্সাইডের পরিমাণ কত?
4. বায়ুমণ্ডলে কার্বন মনোক্সাইডের উৎস কী কী?
5. কার্বন মনোক্সাইড কীভাবে জীবের ক্ষতি করে?
6. ধূমপায়ীদের রক্তে কার্বস্কিহিমোগ্লোবিনের পরিমাণ বেশি কেন?
7. মহিলাদের ধূমপান করা উচিত নয় কেন?
8. বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাইঅক্সাইডের উৎস কী কী?

9. বায়ুমণ্ডলে সালফার ডাইঅক্সাইডের উৎস কী কী?

10. সালফার ডাইঅক্সাইড কীভাবে জীবের ক্ষতি করে?

11. বায়ুমণ্ডলের নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইডের উৎস কী কী?

12. জীবদেহের উপর নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইডের ক্ষতিকারক প্রভাব আলোচনা করুন।

13. বায়ুমণ্ডলে ধুলিকণার উৎস ও তার ক্ষতিকারক প্রভাব আলোচনা করুন।

14. গ্রীনহাউস গ্যাসগুলো কী কী?

15. অম্লবৃষ্টি কীভাবে ঘটে?

16. অম্লবৃষ্টির ক্ষতিকারক প্রভাবগুলি আলোচনা করুন।

17. আলোক-রাসায়নিক ধোঁয়াশা বলতে কী বুঝায়?

18. জীবদেহের উপর আলোক-রাসায়নিক ধোঁয়াশার প্রভাব সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

19. বায়ুমণ্ডলে কীভাবে ওজোন স্তর সৃষ্ট হয়?

20. বায়ুমণ্ডলে ওজোন স্তরের প্রধান ভূমিকা কী?

21. ওজোন স্তর ক্ষয়ের প্রভাব সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

3.11 উত্তরমালা

অনুশীলনী—1

(a) কার্বন মনোক্সাইড, নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড, বালুকা কণা।

(b) পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের মধ্যে ক্ষতিকারক পদার্থের ঘন সমাবেশ যখন জীবমণ্ডলের পক্ষে ক্ষতিকারক হয়, তখন তাকে বায়ুদূষণ বলা হয়।

(c) কার্বন মনোক্সাইড রক্তের হিমোগ্লোবিনের সঙ্গে সুস্থিত জটিল উৎপন্ন করে, তার ফলে রক্তের অক্সিজেন গ্রহণ ও পরিবহণ ক্ষমতা কমে যায়।

(d) নাইট্রিক অ্যাসিড, $3NO_2 + H_2O = 2HNO_3 + NO$

(e) অ্যাস্‌বেস্‌টস্‌ গুঁড়া।

(f) সূক্ষ্ম বালুকা কণা।

অনুশীলনী—2

(a) কার্বন ডাইঅক্সাইড, মিথেন, নাইট্রাস অক্সাইড

(b) ফ্লুওরোকার্বন। ক্লোরোফ্লুওরোকার্বন থেকে যে ক্লোরিন মুক্তমূলক উৎপন্ন হয় তাই ওজোনের বিয়োজনে অনুঘটকের কাজ করে। ফ্লুওরোকার্বন ব্যবহার করলে এই ক্লোরিন মুক্তমূলক গঠনের অবকাশ থাকে না। C—F বন্ধ সুস্থিততর হওয়ায় ফ্লুওরোকার্বন সহজে বিশ্লিষ্ট হয় না।

(c) পারক্সিঅ্যাসিটাইল নাইট্রেট।

(d) অম্লবৃষ্টির ফলে ও জলে দ্রবীভূত কার্বন ডাইঅক্সাইডের দ্রবণের সঙ্গে বিক্রিয়ায় মার্বেল (ক্যালসিয়াম কার্বনেট) ক্ষয়প্রাপ্ত হয় এবং ফলে এর ঔজ্জ্বল্য ও মসৃণতা হ্রাস পায়।

(e) সূর্য থেকে আগত অতিবেগুনি রশ্মি বায়ুমণ্ডলের অক্সিজেনের উপর পড়ে। তখন অক্সিজেনের একাংশ ওজোন রূপভেদে রূপান্তরিত হয়।

$$3O_2 \overset{h\nu}{\rightleftharpoons} 2O_3$$

সর্বশেষ প্রশ্নাবলি

1. যে সকল পদার্থ ও শক্তি বর্জ্য পদার্থ হিসাবে মানুষ পরিত্যাগ করে যারা পরিবেশের উপর ক্ষতিকারক পরিবর্তন সাধন করে তাহাকে দূষণ বলে। বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার মতে পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলের মধ্যে ক্ষতিকারক পদার্থের ঘন সমাবেশ যখন মানুষ ও তার পরিবেশের পক্ষে ক্ষতিকারক হয় তখন তাকে বায়ুদূষণ বলে।

2. বায়ুদূষণকারী প্রধান প্রধান পদার্থগুলি হল (i) বিভিন্ন গ্যাস যেমন সালফার ডাইঅক্সাইড, কার্বন মনোক্সাইড, কার্বন ডাইঅক্সাইড, নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড ইত্যাদি; (ii) তেজস্ক্রিয় গ্যাস যেমন র‍্যাডন; (iii) ধূলিকণা, সীসার কণা, ধোঁয়াশা ইত্যাদি।

3. বায়ুমণ্ডল কার্বন মনোক্সাইডের পরিমাণ 0.1-0.12 ppm.

4. প্রাকৃতিক প্রক্রিয়া যথা আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাতের সময়, বজ্রবিদ্যুৎপাতের সময় কার্বন মনোক্সাইড উৎপন্ন হয়। এছাড়া মোটরগাড়ি থেকে, জৈব পদার্থের দহনের ফলে, বিভিন্ন শিল্প যেমন লৌহ-ইস্পাত শিল্প, কয়লাশিল্প প্রভৃতিতে ব্যবহাত চুল্লী থেকে প্রচুর পরিমাণে কার্বন মনোক্সাইড উৎপন্ন হয়।

5. প্রশ্বাসের সময় কার্বন মনোক্সাইড জীবদেহে প্রবেশ করলে, রক্তের হিমোগ্লোবিনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে কার্বক্সিহিমোগ্লোবিন উৎপন্ন করে, ফলে রক্তের অক্সিজেন বহন ক্ষমতা হ্রাস পায় এবং অক্সিজেনের অভাবে জীবের মৃত্যু ঘটে।

6. সিগারেটের ধোঁয়ায় 400-500 ppm কার্বন মনোক্সাইড থাকে। ধূমপানের সময় ধূমপায়ীদের শরীরে কার্বন মনোক্সাইড প্রবেশ করে এবং রক্তের হিমোগ্লোবিনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে কার্বক্সিহিমোগ্লোবিন তৈরী করে।

7. ধূমপানের ফলে মহিলাদের গর্ভধারণ ক্ষমতা হ্রাস পায়, গর্ভবতী মহিলার অসময়ে সন্তান প্রসব এবং বিকলাঙ্গ শিশু প্রসবের সম্ভভাবনা থাকে।

8. কয়লা ও খনিজ তেলের দহনের ফলে বায়ুমণ্ডলে প্রচুর পরিমাণে কার্বন ডাইঅক্সাইডের উৎপত্তি হয়।

9. অগ্ন্যুৎপাতের ফলে প্রায় 67 শতাংশ সালফার ডাইঅক্সাইড বায়ুতে উন্মুক্ত হয়। এছাড়া জীবাশ্ম জ্বালানীর দহনে, ধাতু নিষ্কাশনে, গাড়ির ধোঁয়া থেকে, সালফিউরিক অ্যাসিড তৈরীর কারখানা থেকে প্রচুর পরিমাণে সালফার ডাইঅক্সাইড গ্যাস বায়ুমণ্ডলে আসে।

10. সালফার ডাইঅক্সাইডের প্রভাবে শ্বাসনালীতে অস্বস্তি ও বায়ু চলাচলে বাঁধার সৃষ্টি হয়। এর ফলে হাঁপানী, শ্বাসকষ্ট প্রভৃতি রোগের উপসর্গ দেখা যায়। বায়ুতে সালফার ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে ফুসফুসে ক্যান্সার হওয়ার সম্ভভাবনা থাকে।

11. যানবাহন নির্গত বর্জ্য ধোঁয়া, নাইট্রোজেনঘটিত যৌগের দহন, শক্তি উৎপাদন কেন্দ্র প্রভৃতি নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড গ্যাসের প্রধান উৎস।

12. বায়ুমণ্ডলে নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইডের পরিমাণ বৃদ্ধি পেলে নিউমোনিয়া, শ্বাসকষ্ট ফুসফুসে ক্যান্সার প্রভৃতি রোগের সৃষ্টি করে।

বেশী গাঢ়ত্বের নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড উদ্ভিদের সালোকসংশ্লেষের হার কমায়, উদ্ভিদের বৃদ্ধি রোধ করে।

13. প্রাকৃতিক উপায়ে যেমন আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত, সাইক্লোন, টর্নেডো প্রভৃতি থেকে প্রচুর পরিমাণে ধুলিকণা বায়ুতে আসে। এছাড়া ধাতু পরিশোধন কেন্দ্র, জ্বালানীর দহন, তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র থেকে প্রচুর পরিমাণে ধুলিকণা পৃথিবীর বায়ুমণ্ডলে আসে।

ক্ষতিকারক প্রভাব ঃ শ্বাসনালীর মাধ্যমে সীসার কণা শরীরে প্রবেশ করলে স্নায়বিক বৈকল্য দেখা যায়, রক্তে লোহিত রক্তিকণিকার উৎপাদন হ্রাস করে। এছাড়া শ্বাসপ্রশ্বাসের সময় সিলিকা শরীরে প্রবেশ করলে দীর্ঘস্থায়ী সিলিকোসিস্ রোগ দেখা যায়।

14. যে সমস্ত গ্যাসের উপস্থিতির জন্য বায়ুমণ্ডলে গ্রীনহাউস ক্রিয়া সংঘটিত হয়, তাদের গ্রীনহাউস গ্যাস বলা হয়। কার্বন ডাইঅক্সাইড প্রধান গ্রীনহাউস গ্যাস। এছাড়া জলীয় বাষ্প, মিথেন, ক্লোরোফ্লুওরোকার্বন (CFC), নাইট্রাস অক্সাইড প্রভৃতি প্রধান প্রধান গ্রীনহাউস গ্যাসসমূহ।

15. জীবাশ্ম ঘটিত জ্বালানীর দহনের ফলে বায়ুমণ্ডলে প্রচুর পরিমাণে SO_2 গ্যাস নির্গত হয়। ইহা বাতাসে উপস্থিত জলীয় বাষ্পের সঙ্গে বিক্রিয়া করে সালফিউরিক অ্যাসিড (H_2SO_4) উৎপন্ন করে। এছাড়া বায়ুতে উপস্থিত নাইট্রোজেন ডাইঅক্সাইড জলের সহিত বিক্রিয়া করে নাইট্রিক অ্যাসিড উৎপন্ন করে। বায়ুতে উৎপন্ন H_2SO_4 অ্যাসিড ও HNO_3 অ্যাসিড বৃষ্টির জলের সহিত মিশে অম্লবৃষ্টিরূপে পৃথিবীর বুকে আপতিত হয়।

16. অম্লবৃষ্টির ফলে মৃত্তিকার pH হ্রাস পায়, ফলে মৃত্তিকার উৎপাদন ক্ষমতা হ্রাস পায় এবং বাস্তুতান্ত্রিক অসাম্যের সৃষ্টি হয়। এছাড়া অম্লবৃষ্টির ফলে স্থাপত্যশিল্প, মনুমেন্ট প্রভৃতির ব্যাপক ক্ষয়ীভবন ঘটে।

17. সূর্যের আলোর প্রভাবে বায়ুতে উপস্থিত নাইট্রোজেনের অক্সাইডসমূহ এবং হাইড্রোকার্বনের রাসায়নিক বিক্রিয়ায় ওজোন, অ্যালডিহাইড, কিটোন, PAN এবং জৈব পারক্সাইড প্রভৃতির সৃষ্টি হয়। এইসকল দূষিত পদার্থসমূহ বায়ুমণ্ডলে মিশে আলোক-রাসায়নিক ধোঁয়াশার সৃষ্টি করে।

18. ধোঁয়াশার উপস্থিত বিভিন্ন ধরনের বিষাক্ত যৌগ যেমন অ্যালডিহাইড, অ্যাক্রোলীন, পারঅক্সাইল নাইট্রেট চোখের অস্বস্তি বা জ্বালার সৃষ্টি করে। এছাড়া পারক্সিঅ্যাসিটাইল নাইট্রেট (PAN) নাকে, গলায় জ্বালা ও বুকে চাপের অনুভূতি সৃষ্টি করে। বায়ুমণ্ডলে ওজোনের সামান্য উপস্থিতি শ্বাসযন্ত্রের সমস্যার সৃষ্টি করে।

19. আলোক-রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে বায়ুমণ্ডলের স্ট্র্যাটোস্ফিয়ার অঞ্চলে বায়ুর অক্সিজেন সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মি শোষণ করে অক্সিজেন পরমাণুতে পরিণত হয়।

$$O_2 \xrightarrow[\text{অতিবেগুনি রশ্মি}]{\text{সূর্যের}} 2O$$

এই অক্সিজেন পরমাণু আণবিক অক্সিজেনের সঙ্গে যুক্ত হয়ে ওজোনে পরিণত হয়।

$$O_2 + O \rightarrow O_3 + (O_2 \text{ বা } N_2)$$

20. মহাশূন্য থেকে আগত ক্ষতিকারক রশ্মি শোষণ করা ওজোন স্তরের প্রধান কাজ। বায়ুমণ্ডলে ওজোনের পরিমাণ হ্রাস পেলে সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মি পৃথিবী-পৃষ্ঠে আপতিত হবে এবং উদ্ভিদ ও প্রাণীর জীবন ধ্বংস হবে।

21. ওজোন স্তরে ওজোনের পরিমাণ হ্রাস পেলে সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মি পৃথিবী-পৃষ্ঠে আপতিত হবে এবং পৃথিবীর তাপমাত্রা বৃদ্ধি পাবে। ফলে মানবদেহে ত্বকের ক্যান্সার দেখা যাবে। এছাড়া সূর্যের অতিবেগুনি রশ্মিতে শরীর বেশীদিন উন্মুক্ত রাখলে মানুষের স্বাভাবিক রোগ-প্রতিরোধ ক্ষমতা হ্রাস পাবে। শারীরিক বৃদ্ধি ও মানসিক বিকাশ বাধাপ্রাপ্ত হবে।

একক 4 □ প্রসাধন সামগ্রী এবং রঞ্জকপদার্থ (Cosmetics and Dyes)

গঠন

4.0 প্রস্তাবনা

উদ্দেশ্য

4.1 প্রসাধনী দ্রব্যের শ্রেণীবিভাগ

4.2 প্রসাধনী সামগ্রীর সংক্ষিপ্ত আলোচনা

4.2.1 ট্যালকম্ পাউডার

4.2.2 ট্যালকম্ পাউডারের উপাদানিক গঠন

4.3 ক্রীম

4.3.1 উপাদানিক গঠন

4.4 চুলরঙিনকারক পদার্থ

4.4.1 অস্থায়ী রঞ্জক

4.4.2 অর্ধস্থায়ী রঞ্জক

4.4.3 স্থায়ী রঞ্জক

4.4.4 স্থায়ী চুলরঞ্জক উপাদান

4.5 হেয়ার স্প্রে

4.5.1 উপাদানসমূহ

4.5.2 হেয়ার স্প্রে-র বিযক্রিয়া

4.5.3 মূল্যায়ন

4.6 ওষ্ঠরঞ্জক

4.6.1 ওষ্ঠরঞ্জকের গুণাবলী

4.6.2 ওষ্ঠরঞ্জক তৈরীর উপাদানসমূহ

4.6.3 ওষ্ঠরঞ্জকের সংযুতি

4.7 সারাংশ

4.8 সর্বশেষ প্রশ্নাবলি

4.9 উত্তরমালা

4.0 প্রস্তাবনা

কসমেটিকস্ কথাটির উৎপত্তিতে Greek শব্দ 'Kosmetikos' থেকে। যার অভিধানগত অর্থ 'সাজসজ্জায় দক্ষ'। মানবসভ্যতার সৃষ্টির সময় থেকেই মানুষ তার প্রাত্যহিক জীবনে নানাপ্রকার রাসায়নিক দ্রব্য ব্যবহার করে আসছে, কিন্তু সেগুলির প্রকৃতি ও উপকরণ সম্ভবন্ধে তাদের ধারণা স্পষ্ট নয়। প্রসাধন সামগ্রীতে ব্যবহৃত বিভিন্ন রাসায়নিক দ্রব্যের গুণাগুণ সম্ভবন্ধে একটি প্রাথমিক জ্ঞান থাকা প্রয়োজন। প্রসাধন দ্রব্যের উপকারিতা ও অপকারিতা সম্ভবন্ধে ধারণা থাকিলে স্বাস্থ্য সচেতনতা বৃদ্ধি পাবে। প্রাচীন ইতিহাস থেকে জানা যায় যে মিশরের রমণীরা চোখের সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য চোখের পাতায় নানারকম অলংকরণ করতেন। পারস্য এবং রোমানরাও নিজেদের দেহের রং ফর্সা করিবার জন্য বিভিন্ন উদ্ভিদ থেকে (যেমন হলুদ, চন্দন) প্রাপ্ত নির্যাস মাখতেন এবং চোখ কালো করার জন্য ভূষাকালি ব্যবহার করতেন। প্রাচীনকালে চীন ও গ্রীসের মেয়েরাও প্রসাধন সামগ্রী ব্যবহারের কৌশল জানতেন বলে উল্লেখ পাওয়া যায়। আমাদের দেশে হিন্দু রমণীরাও সিঁদুর ও মোম মিশ্রিত করিয়া মুখের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করতেন। ত্বক পরিষ্কারের জন্য এখনও দুধের সর, ময়দা, ব্যসন ইত্যাদি নানা উপকরণ ব্যবহার করা হয়ে থাকে। তবে সাম্প্রতিককালে সাবান আর জলের সাহায্যে ত্বক পরিষ্কার করাটা সবচেয়ে জনপ্রিয় পন্থা।

বস্তুতপক্ষে আমরা আমাদের দৈহিক সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য এবং স্ত্রী ও পুরুষ পরস্পরকে আকর্ষণ করার জন্য বিজ্ঞানসম্মতভাবে যে সমস্ত পদার্থ ত্বক চর্চায় ব্যবহার করে থাকি তাদের প্রসাধনী দ্রব্য বা কসমেটিক্স বলা হয়।

উদ্দেশ্য :

এই এককটি পাঠ করার পর আপনি যে বিষয়গুলি সম্ভবন্ধে অবহিত হবেন এবং নিজের হাতে কিছু করার জন্য চেষ্টা করতে পারবেন সেগুলি হল—

- প্রসাধন সামগ্রী বলতে কি বোঝায় এবং এগুলির শ্রেণীবিভাগ
- ট্যালকম্ পাউডারের উপাদানগুলি কি কি হতে পারে
- আমরা যে ক্রীম ব্যবহার করি সেগুলির রাসায়নিক প্রকৃতি কেমন এবং কি কি পদার্থ ব্যবহার করা হয়

- চুলরঙীনকারক পদার্থ কতরকম হতে পারে। স্থায়ী চুলরঞ্জক প্রস্তুতির সময় কি কি বিষয়ের উপর গুরুত্ব দিতে হবে
- ওষ্ঠরঞ্জক পদার্থের গুণাবলী কি কি, এদের তৈরি করার জন্য কি ধরনের উপাদান প্রয়োজন এবং সংযুতি সম্ভবন্ধে ধারণা

4.1 প্রসাধনী দ্রব্যের শ্রেণীবিভাগ

ব্যবহারের ভিত্তিতে প্রসাধনী দ্রব্যসমূহকে বিভিন্নভাবে ভাগ করা যায়। যেমন—

1.ইমালসন হিসাবে—ক্রীম বা লোশন

2.পাউডার হিসাবে—ফেস পাউডার, ট্যালকম্ পাউডার

3.প্রলম্ভিবত মিশ্রণ হিসাবে—পাউডারকে কোন উপযুক্ত তরলে মিশ্রিত করে

4.কাঠ বা স্টীক হিসাবে—লিপিস্টিক, কাজল

4.2 প্রসাধন সামগ্রীর সংক্ষিপ্ত আলোচনা

4.2.1 ট্যালকম্ পাউডার

ট্যালকম্ পাউডারের প্রধান কাজ হল ত্বকের মধ্যে অবশিষ্ট জল বা ঘাম শোষণ করা। যাদের ত্বক খুব তৈলাক্ত বা রুক্ষ্ম তাদের পক্ষে ট্যালকম্ পাউডার ব্যবহার করলে ত্বকের মসৃণতা ফিরে আসে এবং ত্বক স্বাভাবিক হয়ে উঠে। ট্যালকম্ পাউডারে সুগন্ধি (এসেনসিয়াল তেল) মিশ্রিত করা থাকে বলে দেহমনে সতেজ ভাব নিয়ে আসে, ইহার ব্যবহারে শরীরে স্নিগ্ধ ও শীতল অনুভূতির সৃষ্টি হয়, কারণ ট্যালকমের সূক্ষ্মকণাগুলির পৃষ্ঠতলের ক্ষেত্রফল বেশী হওয়ার জন্য পৃষ্ঠতল থেকে তাপ বিকিরিত হয় বলে মনে করা হয়।

4.2.2 ট্যালকম্ পাউডারের উপাদানিক গঠন

ট্যালকম্ পাউডারের মূল উপাদান ট্যালকের খুব সূক্ষ্মকণা, ইহা মূলতঃ ম্যাগনেসিয়াম সিলিকেট, ট্যালক্ খুব নরম ও সাবানের মত পিচ্ছিল বলে ইহাকে 'সোপষ্টোন' বলে। ত্বকে আটকে রাখার জন্য পাউডারের সহিত ধাতব স্টিয়ারেট মেশানো হয়। ট্যালকম্ পাউডারের নমুনা উপাদানিক গঠন নিম্নরূপ।

1. ট্যালক্—অতিরিক্ত জল বা ঘাম শোষণ করে।

2. বোরিক অ্যাসিড—ত্বকের উপর অ্যাসিড বা ক্ষারের সমতা বজায় রাখে।

3. জিঙ্ক অক্সাইড—সাদা আভা সৃষ্টির জন্য।

4. ক্যালসিয়াম কার্বনেট—ঘাম শোষণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করে।

5. ম্যাগনেসিয়াম কার্বনেট—ঘাম শোষণ করার ক্ষমতা বৃদ্ধি করে।

6. স্টার্চ—তৈলাক্ত পদার্থ শোষণ করে।

7. সুগন্ধি—উপাদানিক গন্ধ চাপা দেওয়ার জন্য এবং মনোরম গন্ধ সৃষ্টির জন্য।

উপাদানগুলিকে অনুভূমিক মিশ্রণের মধ্যে ভালোভাবে মিশ্রিত করে পাউডারে পরিণত করা হয় ও প্যাকেটে ভর্তি করা হয়। ট্যালকম্ পাউডারে সাধারণত কোন রঞ্জক পদার্থ যোগ করা হয় না। প্রতিটি উপাদান ব্যাকটেরিয়া মুক্ত হওয়া প্রয়োজন।

নীচে ট্যালকম্ পাউডারের আরও উপাদান সংযুক্তি দেওয়া হল :

(a) 1. ট্যালক্—অতিরিক্ত জল ও ঘাম শোষণ করার জন্য—60%

2. কেওলিন—জল শোষণ করার জন্য—20%

3. জিঙ্ক-অক্সাইড—সাদা আভা সৃষ্টির জন্য—15%

4. জিঙ্ক স্টিয়ারেট—ত্বকে আটকে থাকার জন্য—5%

5. সুগন্ধি—উপাদানিক গন্ধ চাপা দেওয়ার জন্য এবং মনোরম গন্ধ সৃষ্টির জন্য—পরিমাণ মত

প্রতিটি উপাদান ব্যাকটেরিয়া মুক্ত হওয়া প্রয়োজন।

(b) 1. ট্যালক্—অতিরিক্ত জল ও ঘাম শোষণের জন্য—75%

2. কেওলিন—জলশোষণ করার জন্য—10%

3. সিলিকা—ত্বকে আটকে থাকার জন্য—2%

4. ম্যাগনেসিয়াম কার্বনেট—ঘাম ও শোষণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করার জন্য—6%

5. জিংক স্টিয়ারেট—ত্বকে আটকে থাকার জন্য—6%

6. সুগন্ধি—উপাদানিক গন্ধ চাপা দেওয়ার জন্য ও সুগন্ধ সৃষ্টির জন্য—1%

প্রতিটি উপাদান ব্যাকটেরিয়া মুক্ত হওয়া প্রয়োজন।

4.3 ক্রীম

আমাদের ত্বককে সুস্থ ও সতেজ রাখার জন্য ত্বকের পরিচর্যার প্রয়োজন। ত্বক পরিচর্যার জন্য ক্রীম ব্যবহার করা হয়ে থাকে। ক্রীম ত্বকের উপর একটা পাতলা আবরণ সৃষ্টি করে যার ফলে ত্বকে সরাসরি সূর্যকিরণ লাগতে পারে না এবং ত্বককে শুষ্ক হতে দেয় না। ত্বকে আস্তরণ থাকায় সহজে বাহির হতে ধূলাবালি, ময়লা সরাসরি ত্বকের সংস্পর্শে আসতে পারে না। ক্রীম ত্বকের কোলাজেন তন্তুকে রক্ষা করে ত্বকের দৃঢ়তা ও স্থিতিস্থাপকতা অক্ষুণ্ণ রাখতে সাহায্য করে। ক্রীমের বিভিন্ন উপাদান জলের সাথে মিশ্রিত করা হয়, যা ত্বককে শুষ্ক হতে বাধা দেয় এবং ত্বকের সিক্তভাব বজায় রাখে। ত্বকের কোলাজেন তন্তু নষ্ট হলে ত্বক শিথিল হয়ে যায়। আমাদের ত্বকে প্রধানতঃ তিনটি স্তর থাকে, যথা—এপিডারমিস, ডারমিস ও হাইপোডারমিস। এই স্তরগুলির আবার নানা উপস্তর আছে। যেখানে অসংখ্য গ্রন্থি বর্তমান। এই গ্রন্থিগুলি থেকে অসংখ্য নালিকা বের হয়ে একেবারে উপরের স্তরে এসে শেষ হয়েছে।

বয়স হলে ত্বকের স্থিতিস্থাপকতা, উজ্জ্বলতা, নমনীয়তা হ্রাস পায়। এর ফলে ত্বক শিথিল হয়ে পড়ে এবং ত্বকে অনেক ভাঁজ বা বলিরেখা দেখা দেয়। বিভিন্ন স্তরের বিভিন্ন গ্রন্থির তৈলাক্ত নিঃসরণ বয়সবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে কমে আসে, তাই ত্বক হারায় তার স্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্য ও নমনীয়তা। এসময় ত্বকের কোলাজেন ও ইলাস্টিন প্রোটিন ফাইবার (যা ধরে রাখে ত্বকের স্থিতিস্থাপকতা) ভীষণভাবে কমে যায়। তাই এইসব সমস্যা সমাধানের জন্য ক্রীম ব্যবহার করা হয়ে থাকে। ক্রীম ব্যবহার করার আগে ত্বককে ভালোভাবে পরিষ্কার করে নেওয়া একান্ত জরুরী এবং পরিষ্কার করে ক্রীম ব্যবহার করা উচিত।

4.3.1 উপাদানিক গঠন

একটি আধুনিক ক্রীমের উপাদানিক গঠন নিম্নরূপ—

1. ভেসলিন, তরল প্যারাফিন ও ল্যানোলিনের আনুপাতিক মিশ্রণ মাধ্যম হিসাবে কাজ করে।

2. স্টিয়ারিক অ্যাসিড বা অলেয়িক অ্যাসিড এবং সিটাইল অ্যালকোহল—ত্বকের উপর ভেজা ভাবের সৃষ্টি করে।

3. ট্রাইসোডিয়াম ইডিটেট—সংরক্ষক হিসাবে কাজ করে।

4. ডি. এম. ডি. এম. হাইড্যোনটয়েন এবং অ্যালকিল প্যারাবেনসমূহ—জীবাণুনাশক হিসাবে ব্যবহার করা হয়।

5. ডিমিথিকোন—ফেনা উৎপাদনে বাধা সৃষ্টির জন্য।

6. জেরানিয়ল বা ফিনাইল ইথাইল অ্যালকোহল, জৈব সুগন্ধি পদার্থ—সুগন্ধের জন্য ব্যবহার করা হয়।

7. ট্রাইইথানল অ্যামিন—ত্বকের অ্যাসিড ও ক্ষারের সমতা নিয়ন্ত্রণে (বাফার) ব্যবহার করা হয়।

8. জল—প্রয়োজনমত।

অন্য একটি ক্রীমের উপাদানিক গঠন নীচে দেওয়া হল—

1. গ্লিসারল মনো এবং ডাই-স্টিয়ারেট—ত্বকের উপর ময়লা দূর করে ত্বককে পরিষ্কার করে।

2. স্টিয়ারিক অ্যাসিড—ত্বকের উপর ভেজাভাবের সৃষ্টি করে।

3. সিটাইল অ্যালকোহল—ত্বকের উপর ভেজাভাবের সৃষ্টি করে।

4. আইসোপ্রোপাইল-মিরিসটেট—সুগন্ধের জন্য ব্যবহার করা হয়।

5. প্রোপিলিন গ্লাইকল ও সরবিটল সিরাপ—ত্বককে শুষ্ক হতে দেয় না।

6. ট্রাইসোডিয়াম ইডিটেট, প্যারাবিন—সংরক্ষকরূপে যাহাতে কোন ক্ষতিকারক জীবাণু ক্রীমকে নষ্ট করতে না পারে।

7. ট্রাইটেনিয়াম ডাইঅক্সাইড, জিংক-অক্সাইড—সূর্যকিরণ থেকে ত্বককে রক্ষা করে।

8. ট্যালক্—পিচ্ছলকারী হিসাবে ব্যবহার করা হয়।

9. রঞ্জকপদার্থ—সুদৃশ্য করার জন্য ব্যবহার করা হয়।

10. জল—প্রয়োজন মত।

4.4 চুলরঙীনকারক পদার্থ (Hair Dyes)

আমাদের দেশে নারী পুরুষ প্রায় সকলেই চুল সাজানোর জন্য বিভিন্ন রঞ্জকপদার্থ ব্যবহার করে থাকেন। এইসব পদার্থ ব্যবহারের উদ্দেশ্য হল চুলকে নিয়ন্ত্রণে আনা এবং আবহাওয়ার ভিন্নতা যেমন—বায়ু, আর্দ্রতা, শুষ্কতা, শৈত্যতা, তাপ, সূর্যালোক প্রভৃতি থেকে চুলকে রক্ষা করা এবং চুলের ঔজ্জ্বল্য বাড়ানো। চুলের সৌন্দর্যবৃদ্ধি ও সাদা চুল কালো ও রঙীন করার জন্য চুলে বিভিন্নরকম প্রাকৃতিক বা কৃত্রিম রঞ্জকপদার্থ ব্যবহার করা হয়। আমাদের দেশে প্রাকৃতিক রং-এর

মধ্যে প্রধান হল হেনা। এটি মেহেন্দি গাছের পাতায় পাওয়া যায়। হেনার মধ্যে যে রঞ্জকটি থাকে তার নাম 'লাইসোন'। হেনা ব্যবহারের সুবিধা হল এটি ত্বকে জ্বালার সৃষ্টি করে না এবং স্থায়ীভাবে ত্বকে কোন বিষক্রিয়া সৃষ্টি করে না। ইহা হইতে প্রাপ্ত বর্ণ তুলনামূলকভাবে স্থায়ী এবং ইহা কেশরন্ধ্রে জমা হয় না।

আর চুলের কৃত্রিম রং হিসাবে ব্যবহার করা হয় বিভিন্ন অ্যামিনোফেনল (জৈব যৌগ)। ইহার সঙ্গে সামান্য পরিমাণ অন্যান্য পদার্থ মিশিয়ে রং প্রস্তুত করা হয়।

এইসব রঞ্জকপদার্থের কার্যকারিতা অনুযায়ী এদের মোটামুটি তিনভাগে ভাগ করা যায়। যথা—

1. অস্থায়ী রঞ্জক
2. অর্ধস্থায়ী রঞ্জক
3. স্থায়ী রঞ্জক

4.4.1 অস্থায়ী রঞ্জক

এই শ্রেণীর রঞ্জকপদার্থগুলি অস্থায়ী প্রকৃতির। দু-একবার সাবান বা শ্যাম্পু করলেই রঞ্জকপদার্থটি চুল হতে অপসারিত হয়। এই পদার্থগুলি চুলের উপরে একটি অস্থায়ী রঙীন আস্তরণ সৃষ্টি করে ভিতরে প্রবেশ করতে পারে না। যেমন—অ্যাজোডাই, অ্যানথ্রাকুইনোন, ট্রাইফিনাইল মিথেন ইত্যাদি।

4.4.2 অর্ধস্থায়ী রঞ্জক

এই শ্রেণীর রঞ্জকপদার্থগুলি ফেনা সৃষ্টিকারী সাবান বা শ্যাম্পুর উপাদান হিসাবে ব্যবহার করা হয়। ইহারাও চুলের উপর একটি পাতলা আস্তরণ সৃষ্টি করে। যেমন—নাইট্রোফেনিলিন ডাই-অ্যামিন।

4.4.3 স্থায়ী রঞ্জক

এই শ্রেণীর রঞ্জকের ব্যবহার সবচেয়ে বেশী। এইসব স্থায়ী রঞ্জক যখন চুলে প্রয়োগ করা হয় তখন রঞ্জকটি বর্ণহীন থাকে। কিন্তু প্রয়োগের পর সূর্যালোক ও বাতাসের উপস্থিতিতে জারণের ফলে অভিষ্ট রং-এ রঞ্জিত হয়।

(a) চুলের স্থায়ী রং সৃষ্টির জন্য প্রধানতঃ তিন প্রকার রাসায়নিক পদার্থ ব্যবহার করা হয়। যেমন—

1. **ক্ষারক জাতীয় পদার্থ :** ইহারা সাধারণত অ্যারোমেটিক জৈব ক্ষারক, যাহারা সহজেই জারিত হয়। যেমন—প্যারা-অ্যামিনোফেনল, প্যারাডাই-অ্যামিনো অ্যানিসোল, প্যারাটলুইন ডাই-অ্যামিন ইত্যাদি। ইহাদের বিষক্রিয়া আছে এবং ত্বকে জ্বালা সৃষ্টি করে।

2. **সংযোজক বা পরিবর্তক পদার্থ :** ইহারাও সাধারণত অ্যারোমেটিক জৈব ক্ষারক কিন্তু সহজেই জারিত হয় না। যেমন—রেসরসিনল (সবুজাভ), মেটা-অ্যামাইনোফেনল (ম্যাজেন্টা-বাদামী) ইত্যাদি।

3. **জারক পদার্থ :** ইহারা রঞ্জকপদার্থকে জারিত করে অভীষ্ট রং-এ রঞ্জিত করে। যেমন—হাইড্রোজেন পার-অক্সাইড, ইউরিয়া পারঅক্সাইড ইত্যাদি।

(b) স্থায়ী চুলরঞ্জক প্রস্তুতির সময় নিম্নলিখিত বিষয়গুলির উপর গুরুত্ব দিতে হবে।

1. **রঞ্জক বনিয়াদ :** স্থায়ী রঞ্জক প্রস্তুতির সময় কি ধরনের বনিয়াদ হবে অর্থাৎ বনিয়াদের প্রকৃতি যেমন— দ্রবণ, ইমালসন, জেল, শ্যাম্পু বা পাউডার কি হবে, তা আগে ঠিক করতে হবে এবং প্রয়োজনীয় উপাদান নির্বাচন করতে হবে।

2. **রং উৎপাদক উপাদান :** জারণযোগ্য জৈব ক্ষারক এবং উপযুক্ত সংযোজক।

3. **ক্ষার নির্বাচন :** সাধারণত জৈব ক্ষার বা অ্যামোনিয়ার দ্রবণ ব্যবহার করা হয়।

4. **জারণ রোধক :** রঞ্জকটি ব্যবহারের আগে যাতে সূর্যালোক ও বায়ুর দ্বারা জারিত না হয়, তার দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। এজন্য ইহাতে সালফাইট বা অ্যামোনিয়াথায়োগ্লাইকোলেট যোগ করা হয়।

4.4.4 স্থায়ী চুলরঞ্জক উপাদান

1. প্যারা-অ্যামিনোফেনল, অর্থো-অ্যামিনোফেনল, প্যারা-টলুইন ডাই-অ্যামিন—ক্ষারক রূপে।

2. রেসরসিনল, মেটা-অ্যামিনোফেনল—সংযোজক ও পরিবর্তক রূপে।

3. সোডিয়াম সালফাইড, মেটালিনিক অ্যাসিড—বিজারক রূপে।

4. আইসোপ্রোপাইল অ্যালকোহল—দ্রাবক রূপে।

রং উৎপাদনের উপাদানসমূহ শ্যাম্পুতে দ্রবীভূত করে রাখা হয় এবং ব্যবহারের সময় হাইড্রোজেন পার-অক্সাইড মিশ্রিত করিয়া সঙ্গে সঙ্গে চুলে প্রয়োগ করা হয় এবং 20-30 মিনিট অপেক্ষা করার পর রং ফুটে উঠলে জল দিয়ে চুল ধুয়ে পরিষ্কার করা হয়। লেড, সিলভার ও কপারের যৌগ ব্যবহার করলে রং-এর ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধি পায়। বস্তুতপক্ষে আলো, বাতাসের উপস্থিতিতে অদ্রাব্য অক্সাইড ও সালফাইড উৎপন্ন হয় এবং জারণের ফলে কুইনোনিমিন যৌগ উৎপন্ন হওয়ার ফলে চুলে রং ধরে যায়।

4.5 হেয়ার স্প্রে

চুলের স্প্রে এমন একটি উদ্বায়ী তরল পদার্থ যা চুলে স্প্রে করলে সহজেই দ্রুত বাষ্পীভূত হয়ে যায় এবং চুলকে সহজেই নিয়ন্ত্রিত করা যায় ও চুলের স্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্য বজায় রাখে। চুলের স্প্রে ব্যবহারের উদ্দেশ্য হল চুলের উপর অদৃশ্য একধরনের পলিমারের পাতলা আবরণের প্রলেপ দেওয়া, যা বাইরের কোন বস্তু থেকে চুলকে রক্ষা করে। উদ্বায়ী তরল দ্রুত বাষ্পীভূত হলে চুল সঠিক স্থানে থাকিয়া যায়।

4.5.1 উপাদানসমূহ

চুলের স্প্রে-এর প্রধান উপাদানগুলি হল পলিমার, দ্রাবক, প্লাস্টিসাইজার, নিউট্রালাইজার সুগন্ধি দ্রব্য ও অন্যান্য অ্যাডিটিভ দ্রব্য।

পলিমার হিসাবে ব্যবহৃত বিভিন্ন কৃত্রিম পলিমারগুলি হল—পলিভিনাইল, পাইরোলিডোন বা পলিভিনাইল অ্যাসিটেট।

দ্রাবক হিসাবে বিশুদ্ধ ইথাইল অ্যালকোহল ব্যবহৃত হয়।

প্লাস্টিসাইজার হিসাবে বিভিন্ন ইথার, ফিনাইল মিথাইল সিলিকোন, সিলিকোন-গ্লাইকল, কো-পলিমারের যে আস্তরণের সৃষ্টি হয় তাকে নমনীয় করা এবং সঠিক স্থানে চুলকে বিন্যস্ত রাখা। রেজিনের অ্যাসিডমাত্রার উপর নির্ভর করে নিউট্রালাইজার যোগ করা হয়। বর্তমানে হেয়ার স্প্রে-এর মান উন্নত করতে বিভিন্ন ধরনের ভিটামিন, প্রোভিটামিন ও সুগন্ধি দ্রব্য মিশ্রিত করা হয়।

একটি সাধারণ হেয়ার স্প্রে-এর মধ্যে মোটামুটি রেজিন (প্রধানতঃ, করায়াগাম, অ্যাকাসিয়াগাম, ট্রাগাকান্ঙগাম), অনার্দ্র ইথাইল অ্যালকোহল (স্প্রে সৃষ্টিকারী পদার্থের আর্দ্রবিশ্লেষণ প্রতিহত করার জন্য) 40%, ভিনাইল-অ্যাসিটেট, ক্রোটানিক অ্যাসিড কো-পলিমার 1.2%, সুগন্ধি দ্রব্য 0.05%, পান্থানল 0.2%, বাকি অংশে জল থাকে।

পূর্বে হেয়ার স্প্রে-এর দ্রাবক হিসাবে ক্লোরোফ্লুওরোকার্বন ব্যবহার করা হত কিন্তু দূষণগত কারণে বর্তমানে ইহার ব্যবহার সম্পূর্ণরূপে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। ক্লোরোফ্লুওরোকার্বন-এর বিকল্প দ্রাবক হিসাবে হাইড্রোকার্বন (বিউটেন, আইসো-বিউটেন) ব্যবহৃত হচ্ছে। কিন্তু হাইড্রোকার্বন ব্যবহারের ফলেও নিম্নলিখিত অসুবিধার সম্মুখীন হতে হচ্ছে।

1. এই হাইড্রোকার্বনসমূহ উন্নতমানের দ্রাবক নয়। সাহায্যকারী দ্রাবক হিসাবে মিথিলিন ক্লোরাইড ও জল মিশানো হয়।

2. এই হাইড্রোকার্বনসমূহ খুব বেশী পরিমাণে দাহ্য।

4.5.2 হেয়ার স্প্রে এর বিষক্রিয়া

1. অসাবধানতাবশতঃ হেয়ার স্প্রে ফুসফুসে প্রবেশ করলে শ্বাস-প্রশ্বাসজনিত রোগের সৃষ্টি হয়।

2. ক্লোরোফ্লুওরোকার্বনযুক্ত অ্যারোসল, অ্যারোসল স্প্রে অত্যধিক পরিমাণে ব্যবহারের ফলে হৃদরোগের সম্ভভাবনা দেখা যায়।

4.5.3 মূল্যায়ন

নিম্নোক্ত বৈশিষ্ট্যসমূহ যেমন—আস্তরণের কাঠিন্য, উজ্জ্বলতা, স্বচ্ছতা, দ্রাব্যতা, চুলে আটকে থাকা, প্রয়োজনে সহজেই দূরীভূত করা ইত্যাদি নির্ধারণ করে কোন্ রেজিন ব্যবহৃত হবে।

4.6 ওষ্ঠরঞ্জক (Lipstick)

ঠোঁটের সৌন্দর্য বাড়ানোর জন্য এই জাতীয় রঞ্জকপদার্থ দণ্ডের ন্যায় আকারযুক্ত করে বিক্রি করা হয়ে থাকে। যদিও প্রধানতঃ মহিলাদের মধ্যে লিপস্টিকের ব্যবহার বহুল পরিমাণে পরিলক্ষিত হয়। তথাপি উপযুক্তভাবে ইহার ব্যবহার অনেক মহিলা ও পুরুষকে সুদর্শনা ও সুদর্শন করে তোলে। যেহেতু লিপস্টিকের মূল উপাদান তৈল বা চর্বি এবং মোম তাই ইহার ব্যবহারের ফলে ঠোঁট মোলায়েম থাকে ও ফাটা থেকে রক্ষা পায়।

4.6.1 ওষ্ঠরঞ্জকের গুণাবলী

ভালো লিপস্টিকের নিম্নলিখিত গুণাবলী থাকা প্রয়োজন :

1. ভালো লিপস্টিক যেন ব্যবহারের সঙ্গে সঙ্গে শক্ত না হয়ে যায়।

2. অসাবধানতাবশতঃ শরীরের ভেতরে প্রবেশ করলে ভেতরের অংশের উপর যেন কোন প্রভাব সৃষ্টি না করে।

3. ব্যবহার করা সুবিধাজনক হওয়া চাই এবং প্রয়োজন অনুযায়ী লিপস্টিক যেন সহজেই দূরীভূত করা যায়।

4. সহজেই যেন জলে দ্রবীভূত না হয়।

4.6.2 ওষ্ঠরঞ্জক তৈরীর উপাদানসমূহ

লিপস্টিক তৈরীতে ব্যবহৃত মূল উপাদানগুলি হল—কৃত্রিম রেজিন, মোম এবং রঞ্জকপদার্থ।

কৃত্রিম রেজিন হিসাবে ব্যবহৃত উপাদানগুলি হল কারবোমার, পলি ইথিলিন, ইত্যাদি।

ব্যবহৃত মোমের মধ্যে ক্যান্ডেলিলা-মোম, কারনোবা-মোম, মৌমাছি-মোম, পেট্রোলিয়ামঘটিত মোম ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

ঠোঁটের চকচকে ভাব আনতে এবং স্থায়ীত্বের জন্য যথাক্রমে প্রোপিলিন গ্লাইকল এবং কিছু বিশেষ ধরনের পলিমার ব্যবহার করা হয়।

লিপস্টিকে ব্যবহৃত রং অবশ্যই স্বীকৃত হওয়া চাই। এই ধরনের রং অবশ্যই ঠোঁটে ব্যবহারের উপযুক্ত হওয়া চাই। রংগুলি যেন ঠোঁটে কোন ক্ষতিসাধন না করে বা জলে সহজেই দ্রবীভূত না হয়। সাধারণতঃ ঠোঁটে দুইভাবে রং করা হয়—

1. রঞ্জকপদার্থ দ্বারা প্রলেপ দিয়ে

2. একটি স্তরের সাহায্যে ঠোঁটের অসমৃণ চেপে রেখে

বর্তমান প্রচুর পরিমাণে যে রঞ্জকপদার্থগুলি লিপস্টিক উৎপাদনে ব্যবহার করা হয় তাদের মধ্যে জলে দ্রাব্য ইওসিন এবং ফ্লুওরেসিন-এর হ্যালোজেন জাতকগুলির ব্যবহার সবচেয়ে বেশী।

4.6.3 ওষ্ঠরঞ্জকের সংযুতি

একটি ওষ্ঠরঞ্জকের সংযুতি মোটামুটি নিম্নরূপ—

1. কারনোবা-মোম—10%

2. পরিশোধিত মৌচাকের মোম—15%

3. ল্যানোলিন—5%

4. সিটাইল অ্যালকোহল—5%

5. ক্যাস্টর অয়েল—60%

6. স্বীকৃত অদ্রাব্য জৈব রং—1-5%

7. সুগন্ধি—2%

8. জারণ রোধক—0.1%

এক্ষণে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে ওষ্ঠরঞ্জক প্রস্তুতকারী সংস্থাগুলি তাদের নিজস্ব পণ্যসামগ্রীর উৎকর্ষতা ও আকর্ষণীয় করার জন্য বিভিন্ন প্রকার পদার্থ ব্যবহার করে থাকেন। এইসব পদার্থের নাম ও শতকরা মাত্রা প্রকাশ করেন না, বাণিজ্যিক গোপনীয়তার (trade-secret) জন্য।

4.7 সারাংশ

এই এককটি পাঠ করার পর আপনি যে বিষয়গুলি জানতে পারলেন তার সার-সংক্ষেপ হল—

- ট্যালকম্ পাউডারের মূল উপাদান কি? এই পাউডার তৈরি করতে ক্যালসিয়াম বা ম্যাগনেশিয়াম কার্বনেট এবং জিঙ্ক স্টিয়ারেটের প্রয়োজনীয়তা কোথায়
- বয়স বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ত্বক তার স্বাভাবিক ঔজ্জ্বল্য ও নমনীয়তা হারায় কেন? এর পরিপ্রেক্ষিতে ক্রীম ব্যবহার করার উপকারীতা কতখানি
- একটি আধুনিক ক্রীমের উপাদানগুলি কি কি
- চুলরঞ্জকপদার্থের রাসায়নিক প্রকৃতি কেমন, স্থায়ী চুলরঞ্জকপদার্থ প্রস্তুত করার সময় কি কি বিষয়ের উপর গুরুত্ব দিতে হবে
- চুলে স্প্রে করার উদ্দেশ্য কি? সাবধানতা অবলম্ভবন না করলে কি কি অসুবিধা সৃষ্টি হতে পারে
- একটি ওষ্ঠরঞ্জকের সংযুতি সম্ভবন্ধে ধারণা

4.8 সর্বশেষ প্রশ্নাবলি

(A) শূন্যস্থান পূরণ করুন :

1. ট্যালকম্ পাউডার ব্যবহৃত ট্যালক্ আসলে ——।
2. —— একটি সুগন্ধি দ্রব্য।
3. ট্রাইসোডিয়াম ইউটেট —— হিসাবে কাজ করে।
4. হেনায় যে রঞ্জক পদার্থটি থাকে তাকে —— বলে।
5. ত্বকের —— তন্তু নষ্ট হলে ত্বক শিথিল হয়ে যায়।

(B) সঠিক উত্তরটি লিখুন :

1. রেসরসিনল চুলে লাল / সবুজ / হলুদ রং করার জন্য ব্যবহার কার হয়।

2. একটি অস্থায়ী চুল রঞ্চকপদার্থ হল অ্যানথ্র্যাকুইনোন / নাইট্রোফেনিলিন ডায়ামিন / প্যারাঅ্যামিনো ফেনল।

3. ক্রীম ত্বকে আটকে থাকার জন্য জিংক স্টিয়ারেট / জিরানিয়ন / ডিথিথিকোন ব্যবহার করা হয়।

4. চুল রঞ্জকপদার্থে ব্যবহৃত জারক পদার্থটির নাম হাইড্রোজেন পার-অক্সাইড / অ্যানথ্র্যাকুইনোন / ট্যালক্।

5. ওষ্ঠরঞ্জকের লাল রং করার জন্য ব্যবহৃত হয় টাইটেনিয়াম ডাই-অক্সাইড / রুজ / রোডথিন।

(C) সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন :

1. চুলে স্থায়ী রং সৃষ্টির জন্য যে তিন প্রকার রাসায়নিক পদার্থের প্রয়োজন হয় সেগুলি কি?

2. স্থায়ী চুলরঞ্জকের দুটি সংযোজক পদার্থের নাম লিখুন।

3. স্থায়ী চুলরঞ্জকে জারকরোধক পদার্থ মেশান হয় কেন? একটি জারক রোধক পদার্থের নাম লিখুন।

4. হেনারেঙ (henareng) বলতে কি বোঝেন?

5. চুলের রঞ্জকে ব্যবহৃত দুটি প্লাস্টিসাইজারের নাম লিখুন।

6. চুলের স্প্রেতে হাইড্রোকার্বন ব্যবহারের কি কি অসুবিধা তা উল্লেখ করুন।

7. চুলের স্প্রে ব্যবহারের কুফল কি তা উল্লেখ করুন।

8. আধুনিক ক্রীমের উপাদানগুলি কি কি তা উল্লেখ করুন।

9. ট্যালকম্ পাউডারের উপাদানগুলি লিখুন।

10. চুলরঞ্জক হিসাবে হেনা ব্যবহারের সুবিধাগুলি উল্লেখ করুন।

11. একটি ভাল ওষ্ঠরঞ্জকের কি কি গুণ থাকা প্রয়োজন তা উল্লেখ করুন।

(D) উদাহরণ দিন :

1. চুলরঞ্জকপদার্থে ব্যবহৃত হয় এমন একটি জারক দ্রব্যের উদাহরণ দিন।

2. একটি প্রাকৃতিক রঞ্জপদার্থের উদাহরণ দিন।

3. ওষ্ঠরঞ্জকের অস্বচ্ছতা সৃষ্টিকারী পদার্থের উদাহরণ দিন।

4.9 উত্তরমালা

(A)

1. ম্যাগনেসিয়াম সিলিকেট

2. জিরানিয়ল

3. সংরক্ষক

4. লাইসোন

5. কোলাজেন

(B)

1. সবুজ

2. অ্যানথ্র্যাকুইনোন

3. জিংক স্টিয়ারেট

4. হাইড্রোজেন পার-অক্সাইড

5. রুজ

(C)

1. 4.4.3 দেখুন।

2. রেসরসিনল ও মেটা-অ্যামিনোফেনল।

3. রঞ্জকপদার্থটি ব্যবহারের আগেই যাতে আলো ও বায়ুর সংস্পর্শে জারিত না হয়ে যায় তার জন্য রঞ্জকপদার্থটির সহিত জারণরোধক পদার্থ মিশ্রিত করা হয়। জারণরোধক পদার্থ— অ্যামেনিয়াম থায়োগ্লাইকোলেট।

4. নীলগাছের পাতার পাউডারের সঙ্গে হেনার মিশ্রণ নীলাভ-কালো রং উৎপন্ন করে, এই মিশ্রণকে হেনারেঙ বলে।

5. 4.5.1 দেখুন।

6. (a) হাইড্রোকার্বন ভাল দ্রাবক নয়। সে জন্য হাইড্রোকার্বনের সঙ্গে দ্রাবক হিসাবে মিথিলিন ক্লোরাইড ও জল মেশাতে হয়।

(b) হাইড্রোকার্বন অত্যন্ত দাহ্য।

7. (a) স্প্রে শ্বাস-প্রশ্বাসের মাধ্যমে ফুসফুসে প্রবেশ করলে বিভিন্ন শ্বাস-প্রশ্বাসজনিত রোগের সৃষ্টি হয়।

(b) অ্যারোসল স্প্রে ব্যবহারের হৃদরোগে আক্রান্ত হবার সম্ভভাবনা থাকে।

8. 4.3.1 দেখুন।

9. 4.2.2 দেখুন।

10. হেনা ত্বকে জ্বালা সৃষ্টি করে না, স্থায়ীভাবে কোন বিষক্রিয়ার সৃষ্টি করে না, কেশরন্ধ্রে জমা হয় না।

11. 4.6.1 দেখুন।

(D)

1. হাইড্রোজেন পার-অক্সাইড
2. হেনা (ইহাতে লাইসোন থাকে)
3. টাইটেনিয়াম ডাই-অক্সাইড

এ. ও. সি. ০৩
প্রয়োগ অভিমুখী
পাঠ্যক্রম
(গার্হস্থ্য রসায়ন)

পর্যায়
২

একক 5 □ সাবান, পরিষ্কারক ও জল (Soaps, Detergents and Water)

গঠন

5.0 প্রস্তাবনা

উদ্দেশ্য

5.1 উৎপাদন

5.2 সাবানের শ্রেণীবিভাগ

5.3 সাবান প্রস্তুতি

5.3.1 সাবান প্রস্তুতির বিভিন্ন পদ্ধতি

5.3.2 সাবান প্রস্তুতির জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি

5.3.3 সাবান প্রস্তুতির জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল

5.4 সাবানের ধর্ম

5.5 প্রসাধনী সাবান

5.6 তরল সাবান

5.7 সাবানের কার্যকারিতা

5.8 পরিষ্কারক

5.9 পরিষ্কারকের কার্যকারিতা

5.10 পরিষ্কারক ও সাবানের মধ্যে পার্থক্য

5.11 জল

5.12 শ্রেণীবিভাগ

5.12.1 মৃদু জল

5.12.2 খর জল

5.13 খর জলের শ্রেণীবিভাগ

5.13.1 অস্থায়ী খর জল

5.13.2 স্থায়ী খর জল

5.14 খরতা দূরীকরণ বা জল মৃদুকরণ

5.14.1 স্ফুটন পদ্ধতি

5.14.2 ক্লার্কের পদ্ধতি

5.14.3 সোডা পদ্ধতি

5.14.4 চুন-সোডা পদ্ধতি

5.14.5 পারমুটিট বা জিওলাইট পদ্ধতি

5.14.6 আয়ন বিনিময় রেজিন পদ্ধতি

5.15 খর জল ব্যবহারের অসুবিধা

5.16 খরতার মাত্রা

5.17 সারাংশ

5.18 সর্বশেষ প্রশ্নাবলি

5.19 উত্তরমালা

5.0 প্রস্তাবনা

আমাদের দৈনন্দিন জীবনে পরিধেয় ও অন্যান্য বস্ত্র পরিষ্কারের কাজে এবং স্বাস্থ্য রক্ষা ও শরীরের ময়লা দূর করতে যা আমরা সব সময় ব্যবহার করি তাহা হল সাবান। সাবান শিল্প একটি অতি প্রাচীন শিল্প। ইহার ব্যবহার 2500 বৎসর পূর্ব হতে চলে আসছে। মেসোপটেমিয়ায় (বর্তমান নাম ইরাক) সাবান ব্যবহারের উল্লেখ পাওয়া যায়। আধুনিক সাবান প্রস্তুতির কাজ ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম থেকে শুরু হলেও রোমান রাজাদের রাজত্বকালেও ইহার ব্যবহার জানা ছিল। তখন জন্তু-জানোয়ারের চর্বি ও উদ্ভিজ্জ তেলের সঙ্গে কাঠের ভস্ম মিশিয়ে সাবান প্রস্তুত করা হত যাহা পরিধেয় বস্ত্র কাচা ও পরিষ্কার করার কাজে ব্যবহৃত হত। সভ্যতার অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সভ্য মানুষ তাদের আরাম ও স্বাস্থ্য রক্ষার তাগিদে ও পরিধেয়সামগ্রী পরিষ্কারের জন্য এই শিল্পের প্রসার ঘটিয়েছে।

উদ্দেশ্য ঃ

আমাদের শরীর ও পরিধেয়সামগ্রী পরিষ্কার রাখার জন্য সাবান, পরিষ্কারক ও জল ব্যবহার করি। এই এককটি পাঠ করলে আপনি এদের রসায়ন সম্ভবন্ধে বিশেষ জ্ঞান লাভ করতে পারবেন। যেসব তথ্য আপনি জানতে পারবেন সেগুলি হল ঃ

- সাবানের রাসায়নিক সংকেত
- সাবানীভবন বিক্রিয়া কাকে বলে
- সাবান প্রস্তুতির জন্য কি কি যন্ত্রপাতি ও কাঁচামালের প্রয়োজন
- সাবান শিল্পে রঞ্জক ও সুগন্ধি দ্রব্যের প্রয়োজন হয় কেন
- তরল সাবানের উল্লেখযোগ্য কাঁচামালগুলি কি কি
- সাবানের কার্যকারিতা ব্যাখ্যা
- পরিষ্কারক প্রস্তুতিতে কি কি রাসায়নিক উপাদান ব্যবহার করা হয়
- পরিষ্কারক ও সাবানের মধ্যে পার্থক্য
- মৃদু জল ও খর জল বলতে কি বোঝায়
- খর জলে সাবান ব্যবহার করলে সহজে ফেনা হয় না এবং সাবানের অপচয় হয়; কিন্তু পরিষ্কারক খর জলে ব্যবহার করা যায়। এর কারণ কি
- খর জল মৃদু জলে পরিণত করার পদ্ধতিগুলি কি কি
- গৃহস্থালী কার্যে বা শিল্পে খর জল ব্যবহার করলে কি কি অসুবিধার সৃষ্টি হয়
- জলের খরতার মাত্রা প্রকাশের এককগুলি কি কি

5.1 উৎপাদন

সাবান এক প্রকার জৈব লবণ যা উদ্ভিজ্জ তেল অথবা প্রাণীজ চর্বির সঙ্গে কস্টিক সোডা বা কস্টিক পটাশের (ক্ষার) রাসায়নিক বিক্রিয়ায় উৎপন্ন হয়। তেল ও চর্বি থেকে প্রাপ্ত গ্লিসারাইডসমূহকে কস্টিক সোডা বা কস্টিক পটাশ দিয়ে আর্দ্রবিশ্লেষিত করলে দীর্ঘ শৃঙ্খলযুক্ত ফ্যাটি অ্যাসিডের সোডিয়াম বা পটাশিয়াম ঘটিত লবণ (সাবান) পাওয়া যায় এবং গ্লিসারল (প্রোপেন-1,2,3-ট্রাইঅল) উৎপন্ন হয়।

$$\text{উদ্ভিজ্জ তেল বা প্রাণীজ চর্বি} + \text{কস্টিক সোডা} \xrightarrow{\text{উত্তপ্ত}} \text{সিলটিং}$$

$$\text{ফ্যাটি অ্যাসিডের সোডিয়াম লবণ (সাবান)} + \text{গ্লিসারল}$$

উদ্ভিজ্জ তেল অথবা জীবজন্তুর চর্বির (গ্লিসারাইড) সঙ্গে ক্ষারের রাসায়নিক বিক্রিয়ায় তেল বা চর্বির অণুগুলি সাবানে রূপান্তরিত হয় এবং গ্লিসারল মুক্ত হয়। এই বিক্রিয়ায় কিছুটা তাপের উৎপত্তি হয়। তেল বা চর্বির সঙ্গে ক্ষারের রাসায়নিক বিক্রিয়ায় তেল বা চর্বি যে পদ্ধতিতে সাবানে রূপান্তরিত হয় সেই পদ্ধতিকে সাবানীকরণ (saponification) বলে। ফ্যাটি অ্যাসিডের সোডিয়াম লবণকে সোডা সাবান ও পটাশিয়াম লবণকে পটাশ সাবান বলে অবহিত করা হয়।

সাবান উৎপাদনের জন্য সাবানীভবন বিক্রিয়াকে তিনভাবে ব্যবহার করা যেতে পারে। যথা—

1. প্রশম তেল সাবানীভবন—স্টীল নির্মিত পাত্রে তেল ও কস্টিক সোডা স্টীম-এর উপস্থিতিতে 3-4 ঘণ্টা ধরে আর্দ্রবিশ্লেষিত করা হয় এবং ঠাণ্ডা অবস্থায় ছাঁকনির সাহায্যে ছেঁকে সাবান পৃথক করা হয়।

$$\underset{\text{(উদ্ভিজ্জ তেল)}}{\text{গ্লিসারাইল স্টিয়ারেট}} + \text{কস্টিক সোডা} \longrightarrow \underset{\text{(সোডা সাবান)}}{\text{সোডিয়াম স্টিয়ারেট}} + \text{গ্লিসারল}$$

2. আর্দ্রবিশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় চর্বিকে বিয়োজিত করে ফ্যাটি অ্যাসিড উৎপাদন ও উদ্ভুত ফ্যাটি অ্যাসিডের সহিত উপযুক্ত পরিমাণ ক্ষার মিশ্রিত করে প্রশমিত করলে সাবান উৎপন্ন হয়।

$$\underset{\text{(চর্বি)}}{\text{গ্লিসারাইল স্টিয়ারেট}} + \text{জল} \xrightarrow{\text{উত্তাপ}} \text{ফ্যাটি অ্যাসিড} + \text{গ্লিসারল}$$

$$\text{ফ্যাটি অ্যাসিড} + \text{কস্টিক সোডা} \longrightarrow \underset{\text{(সাবান)}}{\text{সোডিয়াম স্টিয়ারেট}} + \text{জল}$$

3. মিথাইল এস্টারের সাবানীভবন—বিক্রিয়ার প্রথমে মিথাইল এস্টার তৈরি করা হয় এবং পরে সাবানীভবন প্রক্রিয়ায় সাবান উৎপাদন করা হয়।

$$\underset{\text{(চর্বি বা তেল)}}{\text{গ্লিসারাইল স্টিয়ারেট}} + \text{মিথানল} \longrightarrow \text{মিথাইল এস্টার} + \text{গ্লিসারল}$$

$$\text{মিথাইল এস্টার} + \text{কস্টিক সোডা} \longrightarrow \underset{\text{(সাবান)}}{\text{সোডিয়াম স্টিয়ারেট}} + \text{মিথানল}$$

5.2 সাবানের শ্রেণীবিভাগ

ব্যবহারিক দিক দিয়ে সাবানকে নিম্নলিখিতভাবে শ্রেণীবিভাগ করা যায় ঃ

1.প্রসাধনী সাবান (toilet soap)

2.কাপড়কাচা সাবান (washing soap)

3.তরল সাবান (liquid soap)

4.দাড়ি কামানোর সাবান (shaving soap)

সাবানকে উপাদানগতভাবে আবার দুইভাগে ভাগ করা যায়। যথা—

1. কঠিন সাবান (hard soap)—সাবানের মধ্যে যদি সংপৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিডের (যেমন পামিটিক অ্যাসিড, স্টিয়ারিক অ্যাসিড) সোডিয়াম লবণ বেশি মাত্রায় থাকে তবে ঐ সাবানকে কঠিন সাবান বলে।
2. কোমল সাবান (soft soap)—সাবানের মধ্যে যদি অসংপৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিডের (যেমন ওলেয়িক অ্যাসিড, লিনোলেনিক অ্যাসিড) পটাশিয়াম বেশি মাত্রায় থাকে তবে ঐ সাবানকে কোমল সাবান বলে।

5.3 সাবান প্রস্তুতি

সাবান প্রস্তুতির দুইটি মূল বিষয় 1. সাবানীকরণ প্রক্রিয়া এবং 2. উৎপন্ন সাবানের সঙ্গে বিভিন্ন রাসায়নিক পদার্থ সমসত্ত্বভাবে মেশানো।

5.3.1 সাবান প্রস্তুতির বিভিন্ন পদ্ধতি

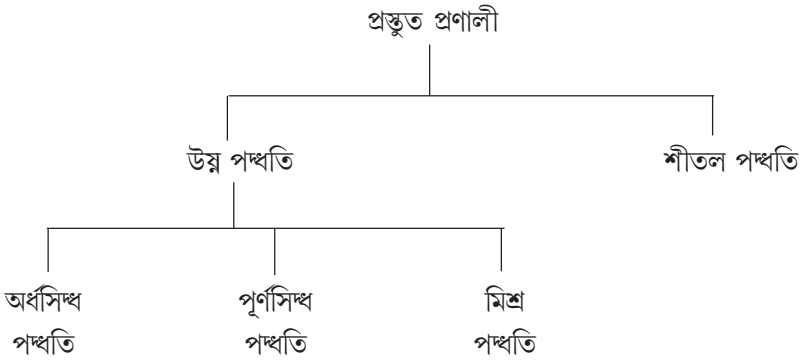

1. উষ্ণ পদ্ধতি—এই পদ্ধতিতে সাধারণত প্রসাধন সাবান ও কাপড় কাচার সাবান প্রস্তুত করা হয়। উষ্ণ পদ্ধতিকে আবার তিনভাগে ভাগ করা যায়। যথা (a) অর্ধসিদ্ধ পদ্ধতি, (b) পূর্ণসিদ্ধ পদ্ধতি, (c) মিশ্র পদ্ধতি।
2. শীতল পদ্ধতি—স্বচ্ছ বা বিশেষ ধরণের সাবানের জন্য সাধারণত শীতল পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়।

5.3.2 সাবান প্রস্তুতির জন্য প্রয়োজনীয় যন্ত্রপাতি

সাবান প্রস্তুতির জন্য সাধারণত নিম্নলিখিত যন্ত্রপাতির প্রয়োজন হয় ঃ

1. কড়াই বা বর্তমানে স্টীলনির্মিত সাবান-কেটলী (পনের-তিরিশ ফুট ব্যাসবিশিষ্ট, আট-দশ ফুট গভীর পাত্র)
2. আলোড়ক খুন্তি বা কাঠের তাড়ু বা বর্তমানে স্বছিদ্র স্টীম কুণ্ডলী
3. উনান তৎসহ জ্বালানী
4. বালতি
5. মগ
6. হাইড্রোমিটার যন্ত্র
7. মাপক চোঙ
8. স্টেনলেশ স্টীলের ছুরি
9. তুলাদণ্ড ও বাটখারা
10. সাবান জমাইবার পাত্র
11. কস্টিক সোডা রাখিবার পাত্র
12. সাবানে ছাপ লাগানোর যন্ত্র
13. কাঠের ট্রে
14. ডাইস
15. মোড়ক দ্রব্য ইত্যাদি

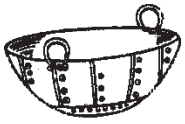

ফুটাইবার যন্ত্র
চিত্র 1

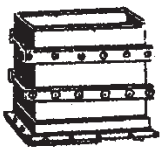

জমাইবার পাত্র
চিত্র 2

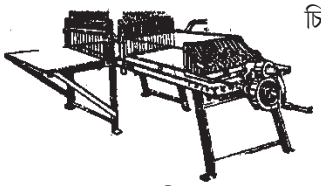

সাবান কাটিবার যন্ত্র
চিত্র 3

গোল সাবানের ছাঁচ

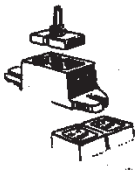

কেক সাবানের ছাঁচ

চিত্র 4

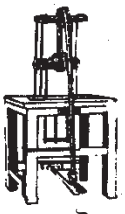

ছাপ লাগাইবার যন্ত্র
চিত্র 5

5.3.3 সাবান প্রস্তুতির জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল

সাবান প্রস্তুতির জন্য দুইটি প্রধান উপাদান নিম্নে দেওয়া হল ঃ

1. উদ্ভিজ্জ তেল অথবা প্রাণীজ চর্বি (ত্রি-গ্লিসারাইড)। এদের প্রধান উৎস—
   (a) গো-চর্বি (শতকরা 75-80 ভাগ)
   (b) ভেড়ার চর্বি
   (c) শূকরের চর্বি ইত্যাদি এবং

(d) নারকেল তেল (শতকরা 15-25 ভাগ)

(e) মহুয়া তেল

(f) বাদাম তেল

(g) পাম, কার্ণাল তেল প্রভৃতি নন্-ডাইং অয়েল

2. ক্ষারজাতীয় পদার্থ—যেমন কস্টিক সোডা বা কস্টিক পটাশ। কস্টিক সোডার উৎস ক্লোরিন শিল্প। সাবান-শিল্পে অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাঁচামালগুলি যথাক্রমে—

(a) জল একটি মূল্যবান উপাদান। ইহা তেল এবং ক্ষারের মধ্যে বিক্রিয়া ঘটাতে সাহায্য করে।

(b) ধারক হিসাবে সোডিয়াম সিলিকেট, সোডা অ্যাশ, ট্রাইসোডিয়াম ফসফেট, সাইট্রেট লবণ ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়।

(c) ফিলার হিসাবে ট্যালক্, স্টার্চ ইত্যাদি।

(d) সুগন্ধি দ্রব্য হিসাবে পাইন তেল, ল্যাভেন্ডার তেল, লেমনগ্রাস তেল, সিট্রেনিলা তেল, স্যান্ডেল তেল, ক্লোভ তেল ইত্যাদি ব্যবহার করা হয়।

(e) লবণ—তেল ও ক্ষারের মিশ্রণ থেকে গ্রেন সোপ প্রস্তুত করার জন্য লবণের ব্যবহার করা হয়। লবণ তেলের মধ্যস্থ গ্লিসারিন ও অন্যান্য অপ্রয়োজনীয় জিনিস আলাদা করতে সাহায্য করে।

(f) রঞ্জক দ্রব্য—সাবানকে দৃষ্টি আকর্ষণীয় করার জন্য বিভিন্ন রঞ্জক পদার্থ যেমন, ইয়োসিন (বেগুণী রং), আলট্রামেরিন গ্লু (নীল রং), টাইটেনিয়াম ডাই-অক্সাইড (সাদা রং) যোগ করা হয়। সোপস্টোন পাউডার সাবানের ওজন বৃদ্ধি করার জন্য ব্যবহার করা হয়।

5.4 সাবানের ধর্ম

1. উন্নতমানের সাবান শক্ত এবং সুগন্ধযুক্ত হয়। 2. সাবান জলে সহজে দ্রবীভূত হয়। 3. সাবান জৈব দ্রাবকেও দ্রাব্য কিন্তু কেরোসিন বা পেট্রোলে দ্রবীভূত হয় না। 4. জলের সঙ্গে প্রচুর ফেনা উৎপন্ন করে।

বিভিন্ন প্রকার তেল থেকে উৎপন্ন সাবান বিভিন্ন প্রকৃতির হয়। নারকেল তেল, বাদাম তেল থেকে উৎপন্ন সাবান সহজে দ্রবীভূত হয় কিন্তু মহুয়া তেলের সাবান সহজে দ্রবীভূত হয় না।

5.5 প্রসাধনী সাবান

প্রসাধনী সাবান প্রস্তুতির জন্য সাধারণত—

(i) নারকেল তেল/বাদাম তেল/ক্যাস্টর তেল

(ii) কস্টিক সোডা

(iii) অ্যালকোহল

(iv) রঞ্জক পদার্থ

(v) সুগন্ধি পদার্থ

নেওয়া হয়।

সাবান-কেটলীতে চর্বি ও তেলকে বিগলিত করার পর কস্টিক সোডা যোগ করা হয় এবং স্টীমের সাহায্যে উত্তপ্ত করা হয়। আর্দ্রবিশ্লেষণ সম্পূর্ণ হলে রঞ্জক পদার্থ যোগ করা হয় এবং পুনরায় উত্তপ্ত করা হয়। অবশেষে সুগন্ধি পদার্থ যোগ করে জমাবার পাত্রে ঢেলে সাবানের কেক তৈরি করা হয়।

5.6 তরল সাবান (Liquid Soap)

ফ্যাটি অ্যাসিডের পটাশিয়াম লবণসমূহ স্বাভাবিক উষ্ণতায় তরল অবস্থায় থাকে বলে এই লবণসমূহকে তরল সাবান বলা হয়।

তরল সাবান তৈরি করার জন্য নীচে উল্লিখিত কাঁচামালের প্রয়োজন ঃ

(i) নারকেল তেল

(ii) কস্টিক পটাশ

(iii) চিনি

(iv) বোরাক্স

(v) গ্লিসারিন

(vi) জল

(vii) সুগন্ধি দ্রব্য

(viii) রঞ্জক পদার্থ

প্রণালী ঃ সাবান-কেটলীতে নারকেল তেল ও পটাশ লেই (25%) 50° সে. উষ্ণতায় উত্তপ্ত করা হয় এবং ভালভাবে মিশ্রিত করা হয়। উত্তপ্ত অবস্থায় নারকেল তেল কস্টিক পটাশ দ্রবণ দ্বারা আর্দ্রবিশ্লেষিত হয় এবং প্রচুর ফেনা উৎপন্ন হয়। সাবানীভবন সম্পূর্ণ হলে চিনি, বোরাক্স, গ্লিসারিন এবং পরিমাণ মত জল মেশান হয়। এরপর এই মিশ্রণকে ভালভাবে আলোড়িত করে সমসত্ত্ব মিশ্রণে পরিণত করা হয়। এবার মিশ্রণের মধ্যে সুগন্ধি দ্রব্য ও রঞ্জক পদার্থ যোগ করা হয় এবং ভালভাবে মিশিয়ে পরিস্রাবণ করা হয়। প্রাপ্ত পরিস্রুত তরলকে বোতলে সংগ্রহ করা হয়।

বর্তমানে প্রসাধনে ও কাপড় কাচার কাজে তরল সাবান ব্যবহার করা হয়।

5.7 সাবানের কার্যকারিতা

সাবান সাধারণত জামাকাপড়ে আটকে থাকা তেল ও চর্বিকে এবং মানুষের দেহের ত্বকে সেঁটে থাকা ময়লা অপসারণের কাজে ব্যবহৃত হয়।

এই ময়লা বা তেল, চর্বি অপসারণের জন্য জলের প্রয়োজন হয়। সাবানের গঠনাকৃতিতে দুটি প্রধান অংশ বর্তমান—একটি জল আকর্ষী বা জল সন্ধানী ধ্রুবীয় অংশ এবং অন্যটি জল বিকর্ষী বা জলাতঙ্কী অধ্রুবীয় হাইড্রোকার্বন অংশ। ধ্রুবীয় প্রান্ত জলে দ্রবণীয় এবং অধ্রুবীয় প্রান্ত তেলে দ্রবণীয়। সাবানের অধ্রুবীয় প্রান্ত সরল কার্বন শৃঙ্খল ঘটিত হাইড্রোকার্বন বা বেঞ্জিন প্রতিস্থাপিত হাইড্রোকার্বন দ্বারা গঠিত। এবং ধ্রুবীয় অংশ অপরাধর্মী আয়ন, পরাধর্মী আয়ন বা পরা বা উভয়ধর্মী আয়ন দ্বারা গঠিত হতে পারে। সুতরাং সাবান একইসঙ্গে পরিধেয় সামগ্রী থেকে বা শরীর থেকে তেল জাতীয় পদার্থ ও জল উভয়কেই গ্রহণ করে এবং বৃহদাকার অনুসমষ্টি মিসেলি (micelle) গঠন করে। যার আকার কলয়েড কণার মত (সূক্ষ্ম কণা যা ছেঁকে পৃথক করা যায় না)। সুতরাং সাবান একটি উত্তম ইমালসন সৃষ্টিকারী পদার্থ। সাবান জলে দ্রবীভূত হলে আয়নীয় অংশ জলের সঙ্গে থাকে এবং হাইড্রোকার্বন বা অধ্রুবীয় অংশ জলের স্তরে বিপরীত দিকে থাকে। জলের মধ্যে সাবানের যে অণুগুলি থাকে সেইগুলি একত্রিত হয়ে একটি বিশেষ আকার গ্রহণ করে যার বাইরের দিকে আয়নীয় অংশ এবং ভিতরের দিকে হাইড্রোকার্বন অংশ থাকে। এই বিশেষ আকারবিশিষ্ট অণুসমূহকে মিসেলি বলে। এই মিসেলিগুলি জলের মধ্যে ভাসমান অবস্থায় থাকে। পরিধেয় সামগ্রী বা শরীরের অংশ থেকে তেল

জাতীয় ময়লা এই মিসেলির সংস্পর্শে এলে সাবানের হাইড্রোকার্বন অংশ ঐ তেলকে দ্রবীভূত করে পরিধেয় সামগ্রী হইতে অপসারিত করে দেয় এবং পরিধেয় জামাকাপড় পরিষ্কার হয়।

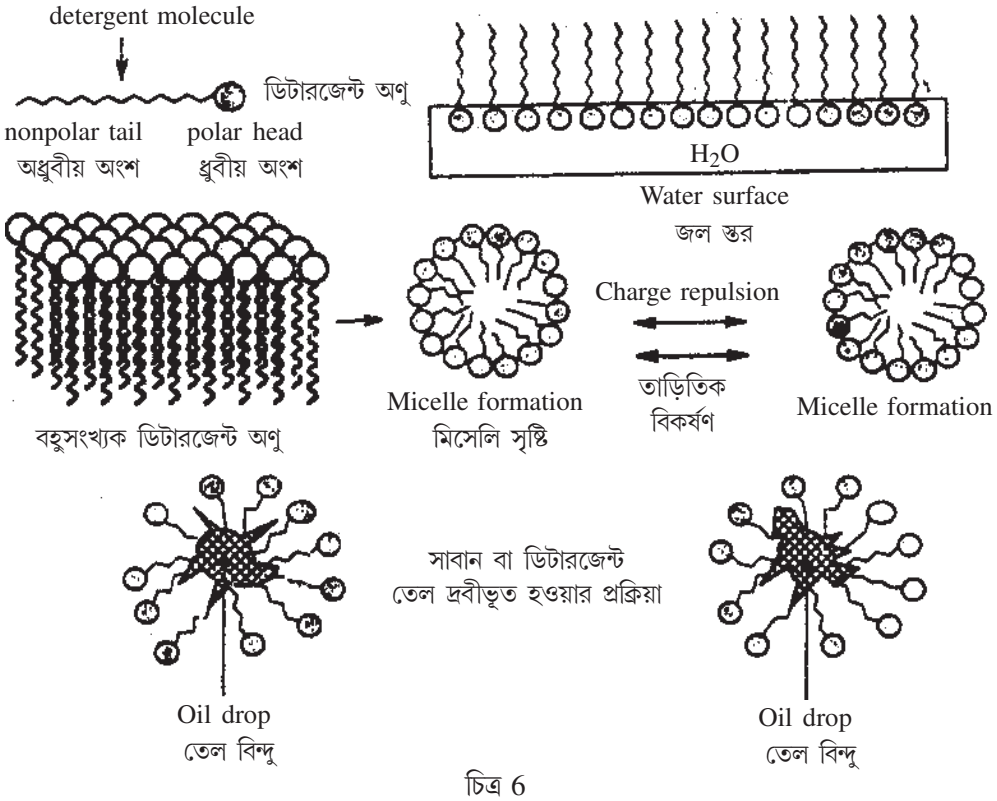

চিত্র 6

5.8 পরিষ্কারক (Detergents)

পরিষ্কারক কতকগুলি রাসায়নিক পদার্থের মিশ্রণ যাহা পরিধেয় সামগ্রীকে পরিষ্কার করতে সাহায্য করে। পরিষ্কারক সাধারণত অ্যালকিল সালফোনিক অ্যাসিড ও অ্যালকিল বেঞ্জিন সালফোনিক অ্যাসিডের সোডিয়াম লবণ। পরিষ্কারকের কার্যকারিতা বৃদ্ধি করার জন্য আরও কিছু রাসায়নিক সামগ্রী মিশ্রিত করা হয়। এইসব রাসায়নিক সামগ্রীকে এক কথায় বিল্ডার্স বলে। এদের কার্যকারিতা নিম্নরূপ ঃ

1. অপঘর্ষক হিসাবে ক্যালসাইট, সূক্ষ্ম বালি মিশ্রিত করা হয়। ইহারা ময়লাকে ঘষে তুলে দিতে সাহায্য করে।
2. পরিষ্কারক হিসাবে অম্লজাতীয় পদার্থ সাইট্রিক অ্যাসিড, ফসফরিক অ্যাসিড এবং ক্ষারজাতীয় পদার্থ যেমন সোডিয়াম কার্বনেট, সোডিয়াম সিলিকেট মিশ্রিত করা হয়। এরা জামা কাপড়ের ময়লা পরিষ্কার করতে সাহায্য করে।

3. জীবাণুনাশকরূপে সোডিয়াম হাইপোক্লোরাইট, পাইন তেল ব্যবহার করা হয়। এরা পরিধেয় সামগ্রীর জীবাণুকে ধ্বংস করে।

4. পুনঃস্থাপক রোধক রূপে পলিকার্বনেট ব্যবহার করা হয়। ইহা অপসৃত ময়লাকে পুনরায় জমতে বাধা দেয়।

5. পরিষ্কারককে সুদৃশ্য করে তোলার জন্য বিভিন্ন সংশ্লেষিত জৈব ও অজৈব রং ব্যবহার করা হয়। সুগন্ধি হিসাবে নানাপ্রকার জৈব সুগন্ধির মিশ্রণ এবং সংরক্ষণের জন্য বিভিন্ন জৈব যৌগ যেমন বিউটাইলেটেড হাইড্রক্সি টলুইন, গ্লুটার‍্যালডিহাইড যোগ করা হয়। এগুলি পরিষ্কারককে জারণ, ব্যাকটেরিয়া, পচন প্রভৃতির হাত থেকে রক্ষা করে এবং পরিষ্কারকে দীর্ঘদিন ধরে সংরক্ষিত রাখতে সাহায্য করে।

5.9 পরিষ্কারকের কার্যকারিতা

সাবানের ন্যায় পরিষ্কারক অণুতে একটি জলাকর্ষী আয়নীয় অংশ এবং একটি জল বিকর্ষী হাইড্রোকার্বন অংশ থাকে। ইহারা জলের সঙ্গে মিসেলি (ময়লা ও পরিষ্কারকের বিক্রিয়ায় উদ্ভুত) উৎপন্ন করে এবং ময়লা অপসারণ করে। পরিষ্কারকের ক্ষারকীয়তা সাবান অপেক্ষা কম। সুতরাং এরা সাবান অপেক্ষা প্রসাধন সামগ্রীর কম ক্ষতি করে। পরিষ্কারকের ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম লবণ জলে দ্রবীভূত হয় বলে এরা খর জলে সাবান অপেক্ষা অধিক কার্যকরী হয়। সাবান ব্যবহারের জন্য মৃদু জল আদর্শ কিন্তু পরিষ্কারক মৃদু বা খর যে কোন জলই ব্যবহার করা যায়।

5.10 পরিষ্কারক ও সাবানের মধ্যে পার্থক্য

পরিষ্কারক ও সাবান উভয়ের মধ্যেই জল বিকর্ষী বা জলাতঙ্কী হাইড্রোকার্বন অংশ এবং জলাকর্ষী আয়নীয় অংশ থাকে। পরিষ্কারক এমন একটি রাসায়নিক মিশ্রণ যার উপরিতল সক্রিয় পদার্থ এবং ফিলার বা উজ্জ্বল কারক বিল্ডার থাকে। বিল্ডারের উপস্থিতির জন্য পরিষ্করণ প্রক্রিয়া বৃদ্ধি পায়। পরিষ্কারকে জীবাণুনাশক পদার্থ যোগ করা হয়। পক্ষান্তরে সাবান একটি উচ্চ আণবিক গুরুত্ববিশিষ্ট জৈব অ্যাসিডের সোডিয়াম বা পটাশিয়াম লবণ। খর জলের মধ্যে দ্রাব্য ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম লবণ সাবানের সঙ্গে বিক্রিয়া করে ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়ামের অদ্রাব্য লবণ গঠন করে। ফলে ফেনা তৈরি

ও পরিষ্কার করায় বাধা সৃষ্টি হয় এবং সাবানের অহেতুক অপচয় হয়। কিন্তু পরিষ্কারক খর জলের সঙ্গে বিক্রিয়া করলেও উৎপন্ন পদার্থ হয় দ্রাব্য না হয় কলয়েড হিসাবে জলে দূরীভূত হয়। পরিষ্কারক জলীয় ও অজলীয় দ্রাবকে দ্রবীভূত করা যায় কিন্তু সাবান শুধুমাত্র জলে দ্রবীভূত হয়। পরিষ্কারকের ক্ষারকীয়তা সাবান অপেক্ষা কম সুতরাং ইহা পরিধেয়সামগ্রীর কম ক্ষতি করে। পরিষ্কারক অতিরিক্ত ব্যবহারের ফলে নর্দমার জলে পরিষ্কারক সঞ্চিত হয়ে জল দূষিত করতে পারে সেই জন্য বর্তমানে কিছু বায়োডিগ্রেডেবল পদার্থ (সহজে জীবাণু দ্বারা বিশ্লিষ্ট হয়) যোগ করা হয়। শর্করা সমন্বিত ধূলো-বালি দূর করার জন্য উৎসেচক অ্যামাইলেজ এবং তৈলাক্ত পদার্থ অপসারণের জন্য লিপিড ভাঙন উৎসেচক লাইপেজ ব্যবহার করা হয়। সুতরাং পরিষ্কারক সাবান অপেক্ষা অধিক কার্যকরী।

পরিষ্কারক কিভাবে জল দূষণে সাহায্য করে তা নীচে খুব সংক্ষেপে বলা হল ঃ

দীর্ঘ শৃঙ্খলযুক্ত অ্যালকিল বেঞ্জিন সালফোনিক অ্যাসিডের সোডিয়াম লবণ পরিষ্কারক হিসাবে ব্যবহৃত হয়। অ্যালকিল মূলকে যদি শাখা না থাকে (unbranched alkyl group) তবে ঐ পরিষ্কারক (linear alkyl sulphonates অথবা LAS) ব্যবহার করার পর প্রাকৃতিক অবনমন বা বিয়োজন ঘটে। সুতরাং এই পরিষ্কারক জল দূষণ করে না। কিন্তু অ্যালকিল মূলকে যদি শাখা থাকে (branched alkyl group) তবে ঐ পরিষ্কারক (alkyl benzene sulphonates অথবা ABS) দীর্ঘদিন অবিকৃত অবস্থায় বিরাজ করে এবং জল দূষণে সাহায্য করে।

তাছাড়া প্রস্তুতকারীরা এখন পরিষ্কারকের সঙ্গে নীচের অজৈব পদার্থগুলিও মিশিয়ে দেন। এগুলি হল—

(i) সোডিয়াম সালফেট 20%

(ii) অজৈব ফসফেট 30-50%

(iii) সোডিয়াম পারবোরেট ফ্লুওরিসিন এবং ফেনা উৎপাদনকারী কিছু পদার্থ

পরিষ্কারক ব্যবহার করার পর নর্দমা দিয়ে যখন এগুলি জলাশয়ে গিয়ে মেশে তখন অতিরিক্ত 'ফসফেট' থাকার ফলে ঐ জলাশয়ের জল অতিপৌষ্টিকতার (eutrophication) জন্য দূষিত হয়। ফসফেট পুষ্টিকর খাদ্যের উপস্থিতিতে নীলচে-সবুজ শ্যাওলা প্রচুর পরিমাণে বাড়তে থাকে। পরে এগুলি পচে গেলে বিযোজনকারী ব্যাকটেরিয়া ও ছত্রাকের বৃদ্ধি ঘটে এবং জলে দ্রবীভূত অক্সিজেন প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হয় এবং অক্সিজেনের পরিমাণ হ্রাস পায়। এর ফলে জলজ প্রাণী ও মাছ অক্সিজেনের অভাবে মারা যায়।

5.11 জল (Water)

পৃথিবীর প্রায় তিন-চতুর্থাংশই জল। আর জলের সহিত আমাদের পরিচয় আমাদের জন্মলগ্ন থেকেই। পূর্বে জল একটি মৌলিক পদার্থ বলে গণ্য হত। কিন্তু 1781 খ্রীষ্টাব্দে বিজ্ঞানী ক্যাভেন্ডিস প্রমাণ করেন জল একটি যৌগিক পদার্থ এবং পরবর্তীকালে বিজ্ঞানী ল্যাভয়সিয়ার বিভিন্ন পরীক্ষার দ্বারা নিশ্চিত হন যে জল হাইড্রোজেন ও অক্সিজেনের সংযোগে সৃষ্ট একটি রাসায়নিক যৌগ।

দৈনন্দিন প্রয়োজনে, কৃষিকার্যে ও শিল্প-প্রয়োজনে এবং পানীয়রূপে জলের ব্যবহার অপরিহার্য। রন্ধনকার্যে, পরিধেয় বস্ত্রাদি ধৌত করতে, কৃষিকার্যে সেচের জন্য, শিল্পে বয়লার চালানোর জন্য, রসায়নগারে দ্রাবকরূপে, ফটোগ্রাফি ও ঔষধি প্রস্তুতিতে প্রচুর জলের প্রয়োজন হয়।

5.12 শ্রেণীবিভাগ

সাবানের সঙ্গে ব্যবহার বিচার করে প্রাকৃতিক জলকে দুভাগে ভাগ করা যায় যথা—1. মৃদু জল এবং 2. খর জল।

5.12.1. মৃদু জল

যে জলে সহজে সাবানের ফেনা উৎপন্ন হয় এবং সহজে খাদ্য দ্রব্য সুসিদ্ধ হয় তাহাকে মৃদু জল বলে।

5.12.2 খর জল

যে জলে সহজে সাবানের ফেনা উৎপন্ন হয় না কিন্তু অনেক সাবান ব্যবহারের ফলে ফেনা হয় বা সহজে খাদ্য দ্রব্য সিদ্ধ হয় না তাকে খর জল বলে। জলে ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম আয়নের বাইকার্বনেট, ক্লোরাইড, সালফেট লবণ দ্রবীভূত থাকে বলে খরতার সৃষ্টি হয়। সাবানের সঙ্গে ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম বিক্রিয়া করে অদ্রাব্য ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম লবণের অধঃক্ষেপ উৎপন্ন করে, ফলে সাবানের ফেনা উৎপন্ন হয় না।

সোডিয়াম স্টিয়ারেট + ক্যালসিয়াম আয়ন ⟶ ক্যালসিয়াম স্টিয়ারেট + সোডিয়াম আয়ন
(সাবান) (খর জল) (সাদা অধঃক্ষেপ)

5.13 খর জলের শ্রেণীবিভাগ

জলের মধ্যে দ্রবীভূত লবণের প্রকৃতি অনুযায়ী খর জলকে দুইভাগে ভাগ করা যায়। যেমন—1. অস্থায়ী খর জল 2. স্থায়ী খর জল।

5.13.1 অস্থায়ী খর জল

ক্যালসিয়াম বাইকার্বনেট, ম্যাগনেসিয়াম বাইকার্বনেট ও কখনো কখনো আয়রন বাইকার্বনেট লবণ জলে দ্রবীভূত থাকলে যে খরতার সৃষ্টি হয় তাকে অস্থায়ী খর জল বলে। শুধুমাত্র ফুটিয়ে ও পরিস্রাবণ প্রক্রিয়ার সাহায্যে জলের অস্থায়ী খরতা দূর করা যায়।

5.13.2 স্থায়ী খর জল

ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম ও আয়রনের ক্লোরাইড, সালফেট লবণ জলে দ্রবীভূত থাকলে জলে যে খরতার সৃষ্টি হয় তাকে স্থায়ী খরতা বলে এবং এই জলকে স্থায়ী খর জল বলে। স্থায়ী খরতাকে শুধুমাত্র ফুটিয়ে খরতা দূর করা যায় না।

5.14 খরতা দূরীকরণ বা জল মৃদুকরণ

খর জলের মধ্যে দ্রবীভূত ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম আয়রনের বাইকার্বনেট, ক্লোরাইড, সালফেট লবণকে কোন সহজ ভৌত প্রক্রিয়া বা রাসায়নিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে অদ্রাব্য ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম আয়রন লবণরূপে অধঃক্ষিপ্ত করতে পারলেই জলের খরতা দূর হয় এবং খর জল মৃদু জলে পরিণত হয়।

নিম্নলিখিত উপায়ে জলের খরতা দূর করা যায় ঃ

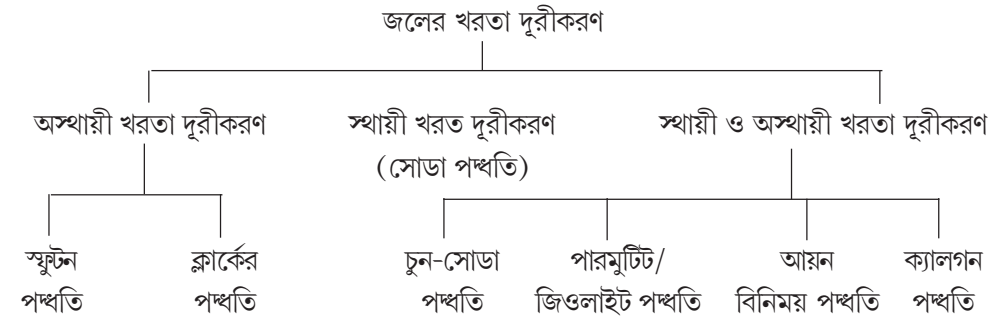

5.14.1 স্ফুটন পদ্ধতি

অস্থায়ী খর জলকে স্ফুটন পদ্ধতির সাহায্যে মৃদু জলে রূপান্তরিত করা যায়। স্ফুটনের ফলে দ্রাব্য ধাতব বাইকার্বনেট লবণ অদ্রাব্য ধাতব কার্বনেটে পরিণত হয় এবং অধঃক্ষিপ্ত হয়। ইহাকে পরিস্রাবণ (ছাঁকন) প্রক্রিয়ার দ্বারা মৃদু জল করা যায়।

$$\underset{\text{(দ্রাব্য ধাতব বাইকার্বনেট)}}{\text{অস্থায়ী খর জল}} \xrightarrow{\text{স্ফুটন}} \underset{\text{(অধঃক্ষেপ)}}{\text{অদ্রাব্য ধাতব কার্বনেট}} \xrightarrow{\text{পরিস্রাবণ}} \text{মৃদু জল}$$

5.14.2 ক্লার্কের পদ্ধতি

এই পদ্ধতিতে অস্থায়ী খর জলের সঙ্গে পরিমাণ মত কলিচুন যোগ করা হয়, ফলে অদ্রাব্য ধাতব কার্বনেটের অধঃক্ষেপণ হয় (থিতিয়ে পড়ে)।

কোক কার্বন বা বালির মধ্যে ছাঁকিয়া অধঃক্ষেপ দূর করা হয় এবং মৃদু জল পাওয়া যায়।

$$\text{অস্থায়ী খর জল} + \text{কলিচুন} = \underset{\text{(অধঃক্ষেপ)}}{\text{ধাতব কার্বনেট}} + \text{মৃদু জল}$$

5.14.3 সোডা পদ্ধতি

এই পদ্ধতিতে স্থায়ী খর জলের সঙ্গে পরিমাণ মত কাপড় কাচার সোডা যোগ করা হয়। ফলে অদ্রাব্য ধাতব কার্বনেট অধঃক্ষিপ্ত হয়। এই অধঃক্ষেপ পরিস্রাবণ করিয়া (ছাঁকিয়া) পৃথক করা হয় এবং মৃদু জল সংগ্রহ করা হয়।

$$\underset{\text{(দ্রাব্য ধাতব লবণ)}}{\text{স্থায়ী খর জল}} + \text{সোডা} = \underset{\text{(অদ্রাব্য অধঃক্ষেপ)}}{\text{ধাতব কার্বনেট}} + \text{দ্রাব্য সোডিয়াম লবণ}$$

5.14.4 চুন-সোডা পদ্ধতি

এই পদ্ধতিতে উপযুক্ত অনুপাতে কলিচুন ও কাপড় কাচার সোডা মিশ্রিত করা হয়। ফলে অদ্রাব্য ধাতব কার্বনেট ও ধাতব হাইড্রক্সাইড অধঃক্ষিপ্ত হয়। পরিস্রাবণ পদ্ধতির সাহায্যে এই অধঃক্ষেপ পৃথক করে মৃদু জল সংগ্রহ করা হয়।

5.14.5 পারমুটিট বা জিওলাইট পদ্ধতি

প্রাকৃতিক জিওলাইট বা কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত পারমুটিট আসলে সোডিয়াম অ্যালুমিনিয়াম সিলিকেট [সোডিয়াম, অ্যালুমিনিয়াম, সিলিকন ও অক্সিজেনের একটি রাসায়নিক যৌগ]।

পারমুটিটকে একটি উচ্চ গোলাকার প্রকোষ্ঠের মধ্যে রাখা হয়। প্রকোষ্ঠের ভিতরে পারমুটিটের উপরে ও নীচে মোটা বালির ও পাথরের নুড়ির স্তর থাকে। প্রকোষ্ঠের উপর হতে খর জলের প্রবাহ পাঠানো হয়। প্রকোষ্ঠের মধ্যে খর জলের মধ্যস্থ দ্রাব্য ধাতব লবণগুলির (ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, আয়রনের লবণ) অদ্রাব্য ধাতব পারমুটিটে পরিণত হয়। প্রকোষ্ঠের তলদেশ হইতে যে পরিস্রুত জল পাওয়া যায় তাহা মৃদু জল।

সোডিয়াম-পারমুটিট + খর জল = ক্যালসিয়াম-পারমুটিট + মৃদু জল

5.14.6 আয়ন বিনিময় রেজিন পদ্ধতি

কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত বৃহদাকার জটিল সংযুতি সংকেত রেজিন প্রধান সালফোনিক অ্যাসিড যৌগ। প্রথমে সোডিয়াম ক্লোরাইড দ্রবণ প্রবাহিত করে রেজিনকে সোডিয়াম লবণে পরিণত করা হয় এবং পরে ইহার উপর দিয়ে খর জল পাঠালে জলের খরতা দূরীভূত হয়। এই প্রক্রিয়ায় রেজিনে উপস্থিত সোডিয়াম আয়নের সঙ্গে খর জলের ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, আয়রন আয়নের বিনিময় ঘটে এবং খর জল মৃদু জলে রূপান্তরিত হয়।

সোডিয়াম-রেজিন + খর জল = ক্যালসিয়াম-রেজিন + মৃদু জল

5.15 খর জল ব্যবহারের অসুবিধা

1. গৃহস্থালির কার্য যেমন পরিধেয় বস্ত্রাদি ধৌতাদি পর্বে খর জল ব্যবহার করা উচিত নয়। খর জলে দ্রবীভূত ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম, আয়রন ধাতুর লবণ সাবানে উপস্থিত সোডিয়াম, পটাশিয়াম লবণের সঙ্গে বিক্রিয়া করে অদ্রাব্য লবণ অধঃক্ষিপ্ত করে ফলে সাবান ও জলের মিশ্রণে ফেনা উৎপাদনে বাধা সৃষ্টি করে। এর ফলে অহেতুক সাবানের অপচয় হয়।
2. কেটলীতে দীর্ঘদিন খর জল উত্তপ্ত করলে কেটলীর ভেতরে একটি অদ্রাব্য তাপ অপরিবাহী আস্তরণ জমা হতে থাকে। ফলে কেটলীতে জল সহজে গরম হয় না। এক্ষেত্রেও অহেতুক জ্বালানীর অপচয় হয়।

3. রন্ধনকার্যেও অত্যধিক খর জল ব্যবহার করা উচিত নয়। কারণ খর জলে খাদ্যদ্রব্য সহজে সুসিদ্ধ হয় না এবং ইহা স্বাস্থ্যের পক্ষে অপকারী।
4. শিল্পের প্রয়োজনে স্টীম উৎপাদনে খর জল ব্যবহার করলে বয়লারের ক্ষতি হয়। বয়লারের তলদেশে যে আস্তরণ পড়ে, তাপ প্রয়োগে তাহার অসমান সম্প্রসারণ ঘটে এবং বয়লার বিস্ফোরণসহ ফেটে যাবার সম্ভভাবনা থাকে।

5.16 খরতার মাত্রা

জলের খরতা মি.গ্রা./লি. বা 'প্রতি দশ লক্ষ ভাগের কত ভাগ' (ppm) এইরূপে প্রকাশ করা হয়। প্রতি দশ লক্ষ ভাগ ওজনের জলে যত ভাগ ওজনের ক্যালসিয়াম কার্বনেট বা উহার সমতুল্যাংক পরিমাণ অপরাপর খরতা সৃষ্টিকারী ধাতব লবণ থাকে তত ভাগ ওজনই ঐ জলের খরতার মাত্রা (parts per million).

5.17 সারাংশ

এই এককের আলোচনা থেকে আপনি যা শিখেছেন তার সারসংক্ষেপ হল ঃ

- সাবান আসলে কি ধরণের রাসায়নিক পদার্থ
- উদ্ভিজ্জ তেল বা প্রাণীজ চর্বি থেকে কি পদ্ধতিতে সাবান প্রস্তুত করা হয়
- সাবান শিল্পে উপজাত হিসাবে গ্লিসারিন পাওয়া যায়
- প্রসাধনী সাবান ও তরল সাবান প্রস্তুতির জন্য কি কি কাঁচামালের প্রয়োজন হয় এবং কিভাবে এগুলি প্রস্তুত করা হয়
- সাবানের গঠনাকৃতিতে দুটি প্রধান অংশ থাকে—জল আকর্ষী ধ্রুবীয় অংশ এবং জলাতঙ্কী অধ্রুবীয় অংশ—এরা কিভাবে কাজ করে
- পরিষ্কারক সাধারণত অ্যালকিল সালফোনিক অ্যাসিড ও অ্যালকিল বেঞ্জিন সালফোনিক অ্যাসিডের সোডিয়াম লবণ
- মৃদু ও খর জলে সাবান ও পরিষ্কারক কিভাবে কাজ করে এবং কোন্ জল সাবানের ব্যবহারের পক্ষে সুবিধাজনক এবং কেন
- মৃদু জল ও খর জল কাদের বলে। জলের খরতা কয় প্রকার ও কি কি? কিভাবে জলের খরতা দূর করা যায়
- খর জল ব্যবহারের অসুবিধাগুলি কি কি
- জলের খরতার মাত্রা মি. গ্রা./লি. বা ppm এককে প্রকাশ করা হয়

5.18 সর্বশেষ প্রশ্নাবলি

1. শূন্যস্থান পূরণ করুন ঃ

   (a) সাবান তৈরির মূল বিক্রিয়াকে বলে ————।

   (b) সাবান শিল্পের মূল উপজাত পদার্থ ————।

   (c) শুধুমাত্র স্ফুটনের সাহায্যে জলের ———— দূর করা যায়।

   (d) পরিষ্কারকের কার্যকারিতা বৃদ্ধি করার জন্য যে সমস্ত রাসায়নিক পদার্থ যোগ করা হয় তাদের ———— বলে।

   (e) কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত সোডিয়াম অ্যালুমিনিয়াম সিলিকেটকে ———— বলে।

   (f) কাপড় পরিষ্কার করার জন্য ———— মৃদু বা খর উভয় জলেই ব্যবহার করা যায়।

2. সঠিক উত্তরটি বেছে নিন ঃ

   (a) সাবান শিল্পের মূল উপজাত পদার্থ গ্লিসারল/কষ্টিক সোডা/গ্লিসারাইল।

   (b) ময়লা কাপড় পরিষ্কার করার জন্য সাবান অপেক্ষা পরিষ্কারক অধিক কার্যকর/একই রকম কার্যকর/কম কার্যকর।

   (c) পারমুটিট পদ্ধতিতে জলের অস্থায়ী খরতা/স্থায়ী খরতা/স্থায়ী ও অস্থায়ী উভয় খরতা দূর করা যায়।

3. সংক্ষিপ্ত উত্তর দিন ঃ

   (a) বর্তমানে ব্যবহৃত সাবানগুলির একটি শ্রেণীবিভাগ করুন।

   (b) প্রসাধনী সাবান প্রস্তুতির জন্য কি কি কাঁচামালের প্রয়োজন সেগুলি উল্লেখ করুন।

   (c) তরল সাবান কিভাবে প্রস্তুত করা হয় তা বর্ণনা করুন।

   (d) বিল্ডার্সের কার্যকারিতা উল্লেখ করুন।

   (e) পরিষ্কারক ও সাবানের মধ্যে পার্থক্য উল্লেখ করুন।

   (f) সাবানের কার্যকারিতা উল্লেখ করুন।

   (g) পরিষ্কারকে কি কি উৎসেচক ব্যবহার করা হয় তার উল্লেখ করুন।

(h) মৃদু জল ও খর জল বলতে কি বোঝেন?

(i) অস্থায়ী খর জলের মৃদুকরণ কিভাবে করা হয় তা বর্ণনা করুন।

(j) খর জলের ব্যবহারিক অসুবিধাগুলি কি কি তা বুঝিয়ে বলুন।

(k) জলের খরতার মাত্রা কিভাবে প্রকাশ করা হয়।

4. একটি পরিষ্কারকের সংযুতি শতাংশের উল্লেখ করুন।

5.19 উত্তরমালা

1. (a) সাবানীভবন

   (b) গ্লিসারিন

   (c) অস্থায়ী খরতা

   (d) বিল্ডার্স

   (e) পারমুটিট

   (f) পরিষ্কারক

2. (a) গ্লিসারল

   (b) অধিক কার্যকর

   (c) স্থায়ী ও অস্থায়ী উভয় খরতা

3. (a) প্রসাধনী সাবান, কাপড় কাচার সাবান, দাড়ি কামানোর সাবান এবং তরল সাবান

   (b) 5.5 দেখুন।

   (c) 5.6 দেখুন।

   (d) 5.8 দেখুন।

   (e) 5.10 দেখুন।

   (f) 5.7 দেখুন।

   (g) 5.10 দেখুন।

   (h) 5.12.1 এবং 5.12.2 দেখুন।

(i) 5.14.1 এবং 5.14.2 দেখুন।

(j) 5.15 দেখুন।

(k) 5.16 দেখুন।

4.	(i)	বোরাইল বেঞ্জিন সোডিয়াম সালফোনেট	7%
	(ii)	সোডিয়াম লরাইল সালফেট (সক্রিয় পদার্থ)	5%
	(iii)	সোডিয়াম সালফেট (বিল্ডার্স)	20%
	(iv)	সোডিয়াম ট্রাইপলিফসফেট (বিল্ডার্স)	40%
	(v)	টেট্রাসোডিয়াম পাইরোফসফেট (বিল্ডার্স)	10%
	(vi)	সোডিয়াম সিলিকেট (ফিলার)	3%
	(vii)	সোডিয়াম কার্বক্সিমিথাইল সেলুলোজ	3%
	(viii)	সোডিয়াম পারবোরেট (বিরঞ্জক)	3-5%
	(ix)	জল	অবশিষ্ট

একক 6 □ ওষুধ ও জীবাণুনাশকের রসায়ন (Medicines and Antiseptics)

গঠন

6.0 প্রস্তাবনা

উদ্দেশ্য

6.1 ওষুধের শ্রেণীবিভাগ

6.1.1 সাধারণ জ্বর, ব্যথা-বেদনা, প্রদাহ উপশমের জন্য ব্যবহৃত ওষুধ

6.1.2 চর্মরোগের ওষুধ

6.1.3 পচন নিবারক ওষুধ

6.1.4 চেতনানাশক ওষুধ

6.1.5 অম্লনাশক ওষুধ

6.1.6 ম্যালেরিয়া প্রতিরোধী ওষুধসমূহ

6.1.7 অ্যামিবোয়িক ও ব্যাসিল্যারি আমাশয় রোগের উপশমের জন্য ওষুধ

6.1.8 অ্যান্টিবায়টিক ওষুধসমূহ

6.1.9 সালফোনামাইড ওষুধসমূহ

6.2 সারাংশ

6.3 সর্বশেষ প্রশ্নাবলি

6.4 উত্তরমালা

6.0 প্রস্তাবনা

মানবসভ্যতার বিকাশ যখন ঘটেনি এবং মানুষের মনের অন্ধকার জগত যখন বিজ্ঞানের আলোয় আলোকিত হয়নি তখনও শারীরিক অসুস্থতার হাত থেকে নিজেকে বাঁচাতে মানুষ নানারকমের ফল, মূল, গাছ-গাছলার পাতা ও ছাল প্রভৃতি ব্যবহার করতে জানত।

বিজ্ঞানের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে মানুষের মনের বিজ্ঞানভিত্তিক প্রসারতাও বাড়ল। কোন্ ওষুধ প্রয়োগে কোন্ রোগের উপসম হয় তা মানুষের করায়ত্ত্ব হল। শুধু বনৌষধির ব্যবহারই নয়, রসায়নাগারে বিভিন্ন ওষুধ সংশ্লেষণ পদ্ধতিতে কিভাবে প্রস্তুত করা যায় তার রসায়নও বিজ্ঞানীদের কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল। বিংশ শতাব্দিতে বিজ্ঞানীরা এমন সব জীবনদায়ী ওষুধ আবিষ্কার করেছেন যা শুধু রোগের উপশমই করেনি, মানুষের পরমায়ুও বাড়িয়ে দিয়েছে। কোন্ ওষুধ ব্যবহার করলে সাধারণ রোগের হাত থেকে রক্ষা পাওয়া যায় তা আমরা অনেকেই কিছু না কিছু জানি। সর্দি-কাশির জন্য বনৌষধি, যেমন তুলসী পাতা, শিউলি পাতা বা বাসক পাতার রস খেলে বেশ উপকার পাওয়া যায়। আবার ম্যালেরিয়া রোগের উপশমের জন্য কুইনিন, ক্লোরোকুইন বা এই জাতীয় ওষুধ ব্যবহার করা হয়। মাথাধরা, শরীরের ব্যথা-বেদনার হাত থেকে সাময়িক রেহাই পাবার জন্য ডিস্প্রিন, অ্যানাসিন ব্যবহার করে থাকি। খেলতে গিয়ে পায়ে ব্যথা পেলে আয়োডেক্স, ইউথেরিয়া, মুভ প্রভৃতি মলম ব্যবহার করে উপকার পাই। শরীরের কোন অংশ সামান্য কেটে গেলে সঙ্গে সঙ্গে সেই অংশটুকু পরিষ্কার জল দিয়ে ধুয়ে ও পরে শুকিয়ে নিয়ে মারকিউরোক্রোম (2% অ্যালকোহলীয় দ্রবণ) লাগালে সহজেই ক্ষত স্থানের পচন রোধ করা যায়। গুরুপাক খাবার খেলে অম্লের সৃষ্টি হয়। জেলুসিল, অ্যালুড্রেক্স, পলিক্রল প্রভৃতি ওষুধ খেলে অম্লের হাত থেকে রেহাই পাওয়া যায়। রোগ নিবারণের জন্য এইরকম আরো অনেক উদাহরণ আছে।

রোগ উপশমের জন্য অবশ্যই ডাক্তারের পরামর্শ মত সঠিক ওষুধ গ্রহণ করতে হবে।

এই এককে আমরা কয়েকটি নির্দিষ্ট ওষুধের প্রস্তুতি খুব সংক্ষেপে ও সাধারণভাবে আলোচনা করব।

শিক্ষার্থীরা বিশেষ অনুসন্ধিৎসা মেটানোর জন্য কিছু ওষুধের রাসায়নিক গঠন উল্লেখ করা হল।

উদ্দেশ্য ঃ

এই এককটি পাঠের উদ্দেশ্য হল যে সকল রাসায়নিক যৌগ সাধারণ রোগের উপশমের জন্য ওষুধ হিসাবে ব্যবহৃত হয় তাদের সঙ্গে আপনি পরিচিত হতে পারবেন। আপনি যা যা জানতে পারবেন তা হল—

- ওষুধের শ্রেণীবিভাগকরণ
- ব্যথাবেদনা, প্রদাহ ও সাধারণ জ্বর প্রশমনের জন্য ওষুধ চিহ্নিতকরণ ও প্রস্তুতি
- চর্মরোগের জন্য ব্যবহৃত ওষুধের প্রকৃতি
- পচননিবারক, অম্লনাশক ও চেতনানাশক ওষুধের নাম ও রাসায়নিক প্রকৃতি

- ম্যালেরিয়া নিরাময়ের জন্য ওষুধ এবং তাদের রাসায়নিক গঠন
- আমাশয় রোগ নিরাময় করার জন্য ওষুধসমূহ
- জীবাণুনাশক ও সংক্রমকরোগ প্রশমনের জন্য ব্যবহৃত কয়েকটি অ্যান্টিবায়টিকের নাম ও গঠন
- রোগ উপশমে সালফোনামাইড-এর প্রয়োগ এবং এদের রাসায়নিক গঠন

6.1 ওষুধের শ্রেণীবিভাগ

এক এক ধরনের ওষুধ এক এক রকম রোগের উপশমের জন্য ব্যবহৃত হয়। কোন্ রোগের জন্য কোন্ ওষুধ বা ওষুধসমূহের প্রয়োজন, এদের গঠন প্রকৃতি কেমন, তার উপর ভিত্তি করেই ওষুধের শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছে। এই এককের গঠনেই তা পরিষ্কার করে বলে দেওয়া হয়েছে। যেমন, সাধারণ জ্বর, ব্যথা-বেদনার জন্য প্যারাসিটামল, ক্রোসিন; চর্মরোগের জন্য স্যালিসাইলিক অ্যাসিড। চেতনানাশক ও ঘুমের ওষুধ হিসাবে প্রতিস্থাপিত বারবিটিউরিক অ্যাসিড—যেমন ভেরোনান, লুমিনালের ব্যবহার। ম্যালেরিয়া রোগের জন্য কুইনিন, ক্লোরোকুইন; অম্লনাশক ওষুধ হিসাবে ধাতব হাইড্রক্সাইড ব্যবহার করা হয়। জীবাণুনাশক ও সংক্রামক রোগের জন্য পেনিসিলিন; টাইফয়েড রোগের জন্য ক্লোরামফিনিকল ও যক্ষ্মারোগের জন্য স্ট্রেপটোমাইসিন প্রভৃতি ওষুধের সঙ্গে আমরা পরিচিত।

6.1.1 সাধারণ জ্বর, ব্যথা-বেদনা, প্রদাহ উপশমের জন্য ব্যবহৃত ওষুধ (Antipyretic and Analgesic Drugs)

এখানে তিনটি ওষুধের নাম, সংশ্লেষণ পদ্ধতিতে প্রস্তুতি ও ধর্ম সংক্ষেপে বলা হল ঃ

1. প্যারাসিটামল (paracetamol) :

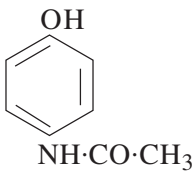

এই যৌগের রাসায়নিক নাম প্যারাঅ্যাসিটাইল অ্যামিনো ফিনল।

প্রস্তুতি ঃ বিভিন্ন পদ্ধতিতে এই যৌগ তৈরি করা যায়। এখানে ফিনল থেকে প্রস্তুতি সংক্ষেপে বর্ণনা করা হল।

ফিনলকে সোডিয়াম হাইড্রক্সাইডে দ্রবিভূত করা হয়। কম তাপমাত্রায় (0–5°) এই দ্রবণে লঘু হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড ও সোডিয়াম নাইট্রাইট যোগ করলে ফিনল, প্যারানাইট্রোসো ফিনলে পরিণত হয়। এবার প্রাপ্ত যৌগকে Fe-গুড়া ও লঘু HCl-এর সাহায্যে বিজারিত করলে প্যারাঅ্যামিনোফিনল পাওয়া যাবে। এই যৌগকে অ্যাসেটিক অ্যানহাইড্রাইডের সঙ্গে বিক্রিয়া করলে প্যারাসিটামল উৎপন্ন হয়।

প্যারাসিটামল

ব্যবহার ঃ জ্বর, ব্যথা-বেদনা—যেমন, মাথাধরা, দাঁতের ব্যথার জন্য ব্যবহৃত হয়। বয়স্কদের জন্য টেবলেট এবং শিশুদের জন্য প্যারাসিটামল সিরাপ দেওয়া হয়। বাজারে প্রচলিত ওষুধ কম্বিফ্লামে (combiflam) প্যারাসিটামল থাকে।

2. অ্যাসপিরিন ঃ রাসায়নিক নাম অ্যাসিটাইল স্যালিসাইলিক অ্যাসিড।

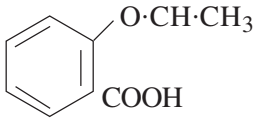

অ্যাসপিরিন

প্রস্তুতি ঃ স্যালিসাইলিক অ্যাসিড এবং অ্যাসেটিক অ্যানহাইড্রাইডের বিক্রিয়ায় অ্যাসপিরিন তৈরি করা হয়।

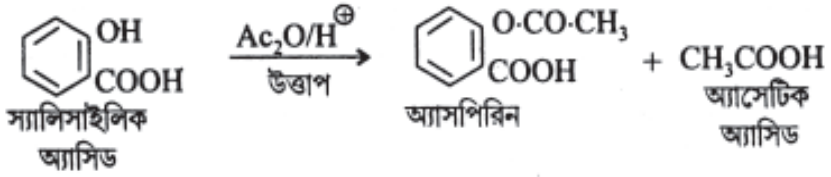

ধর্ম ঃ সাদা কঠিন পদার্থ, গলনাঙ্ক 135°

ব্যবহার ঃ গা-হাত-পা ব্যথা, মাথাধরা উপশমের জন্য ব্যবহৃত হয়।

অ্যাসপিরিন আর্দ্রবিশ্লেষিত হয়ে স্যালিসাইলিক অ্যাসিড উৎপন্ন হয়। বেশি পরিমাণে ব্যবহার করলে অথবা অনেকদিন ধরে এই ওষুধ খেলে খাদ্যনালীতে আলসার সৃষ্টি হবার সম্ভভাবনা থাকে। তাই এই ওষুধ ব্যবহার করার পর প্রচুর পরিমাণে জল পান করা উচিত।

3. মিথাইল স্যালিসাইলেট ঃ

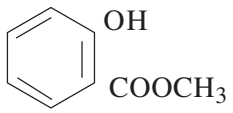

মিথাইল স্যালিসাইলেট

প্রস্তুতি ঃ এটি একটি এস্টারজাতীয় যৌগ। গাঢ় সালফিউরিক অ্যাসিডের উপস্থিতিতে ও তাপ প্রয়োগের ফলে স্যালিসাইলিক অ্যাসিড এবং বিশুদ্ধ মিথানলের বিক্রিয়ায় এই যৌগটি উৎপন্ন হয়। বিক্রিয়া নিম্নরূপ ঃ

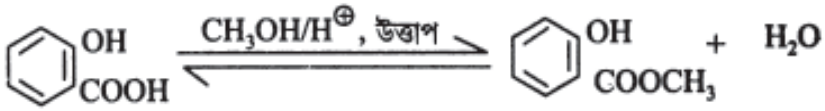

ধর্ম ঃ সুগন্ধযুক্ত বর্ণহীন তরল পদার্থ। স্ফুটনাঙ্ক 224°. জলে অদ্রাব্য, কিন্তু জৈব দ্রাবকে দ্রাব্য।

ব্যবহার ঃ হাতে-পায়ে ব্যথা উপশমের জন্য ব্যবহৃত হয়। আয়োডেক্স, ইউথেরিয়া, মুভ প্রভৃতি মলমে এই যৌগটি বর্তমান।

অনুশীলনী—1

(1) সাধারণ জ্বর উপশমের জন্য একটি জৈব যৌগের নাম লিখুন। এই যৌগে কি কি মৌল আছে তা উল্লেখ করে যৌগটির সংকেত লিখুন।

(2) অ্যাসপিরিন যৌগটি কোন্ কোন্ রোগের জন্য ব্যবহার করা হয়? যৌগটির গঠন সংকেত লিখুন।

6.1.2 চর্মরোগের ওষুধ

আমরা অনেক সময় বিভিন্ন ধরনের চর্মরোগের শিকার হয়ে থাকি। এই রোগের হাত থেকে রেহাই পাবার জন্য খাবার ওষুধ ছাড়াও বিভিন্ন মলম যেমন—Betnovet N, Betnovet C, Diprovate, Supragent ব্যবহার করে উপকার পাওয়া যায়। রোগের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে কি ওষুধ ব্যবহার

করতে হবে তা অবশ্যই ডাক্তার পরামর্শ দেবেন। এখানে আমরা শুধুমাত্র দাঁদ রোগ উপশমের জন্য একটি ওষুধের নাম উল্লেখ করব যা ব্যবহার করলে দাঁদ সহজেই সেরে যায়।

রেক্‌টিফায়েড স্পিরিটে স্যালিসাইলিক অ্যাসিডের সম্পৃক্ত দ্রবণ তৈরি করে আক্রান্ত জায়গায় দুই-তিনদিন ব্যবহার করলে সহজেই রোগমুক্ত হওয়া যায়।

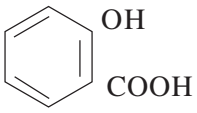

স্যালিসাইলিক অ্যাসিড

6.1.3 পচন নিবারক ওষুধ (Antiseptic Drugs)

মারকিউরোক্রোম ঃ

হাত, পা বা শরীরের কোনও জায়গা সামান্য কেটে গেলে আমরা পচন নিবারক ওষুধ ব্যবহার করে থাকি। ক্ষত জায়গাটি ভাল করে পরিস্কার জলে ধুয়ে ও শুষ্ক করে ওষুধ লাগান উচিত।

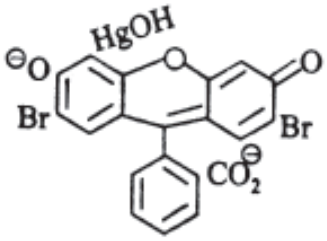

মারকিউরোক্রোম

মারকিউরোক্রোম একটি পচন নিবারক ওষুধ। এটি একটি ধাতব জৈব যৌগ। এই যৌগে একটি পারদ পরমাণু ও দুটি ব্রোমিন পরমাণুর উপস্থিতি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। যৌগটির রাসায়নিক গঠন উপরে দেখান হয়েছে। তবে বর্তমানে চিকিৎসকেরা এর ব্যবহারে নিরুৎসাহিত করছেন। পশু চিকিৎসায় এটি এখনও ব্যবহৃত হয়।

ব্যবহারের পদ্ধতি ঃ 2% মারকিউরোক্রোমের অ্যালকোহলীয় দ্রবণ (লাল বর্ণের) ক্ষতস্থানে ব্যবহার করা হয়।

মারকিউরোক্রোম ছাড়া আরও অনেক পচন নিবারক ওষুধ ক্রিম হিসাবে ব্যবহার করা হয়। যেমন— বোরোলীন, বোরোপ্লাস, বোরোক্যালেন্ডুলা ও বোরোসফট্। এদের প্রত্যেকের মধ্যেই বোরিক অ্যাসিড আছে। বোরোলীনে, বোরিক অ্যাসিড (H_3BO_3) আছে 1% (w/w) এবং জিঙ্ক অক্সাইড (ZnO) আছে 3% (w/w).

6.1.4 চেতনানাশক ওষুধ
(Sedatives, Hypnotics and Tranquilisers)

কেন্দ্রীয় নার্ভতন্ত্রকে অবশ করার জন্য বিভিন্ন ধরনের ওষুধ পাওয়া যায়।

প্রতিস্থাপিত বারবিটিউরিক অ্যাসিড ঃ

সিডেটিভস্ ও হিপনোটিকস্ ওষুধ ব্যবহার করলে ঘুমের বা ঝিমানোর আবেশ তৈরি হয়। যেমন প্রতিস্থাপিত বারবিটিউরিক অ্যাসিড। এখানে এদের নাম ও রাসায়নিক গঠন বৈচিত্র্য উল্লেখ করা হল।

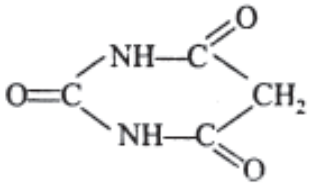

বারবিটিউরিক অ্যাসিড

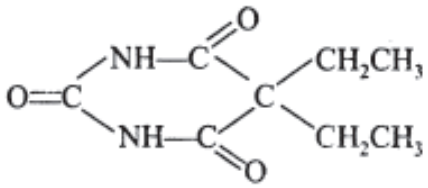

বারবিটোন বা ভেরোনাল
(5,5-ডাই-ইথাইল বারবিটিউরিক অ্যাসিড)

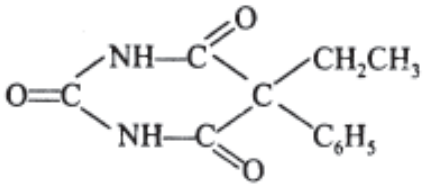

ফেনোবারবিটাল
বা
লুমিনাল
(5-ইথাইল-5-ফিনাইল
বারবিটিউরিক অ্যাসিড)

এখানে শুধু বারবিটিউরিক অ্যাসিড এবং লুমিনালের সংশ্লেষ পদ্ধতিতে প্রস্তুতি দেখান হল।

1. বারবিটিউরিক অ্যাসিড ঃ

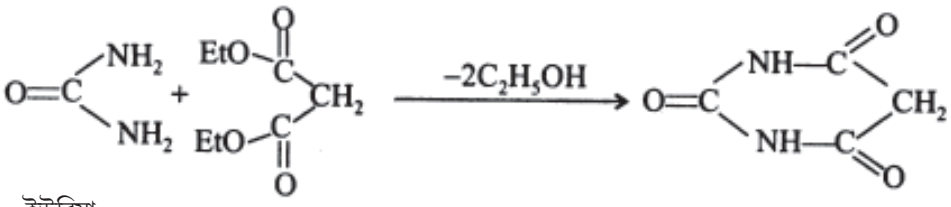

ইউরিয়া

ডাই-ইথাইল
ম্যালোনেট

2. লুমিনাল ঃ

ইথাইল ফিনাইল অ্যাসিটেট এবং ডাই-ইথাইল কার্বনেটের বিক্রিয়ায় চারটি ধাপে লুমিনাল প্রস্তুত করা হয়।

প্রথম ধাপ ঃ

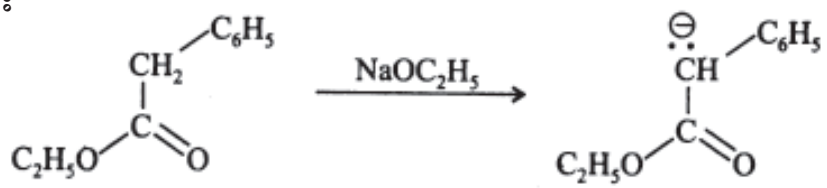

ইথাইলফিনাইল
অ্যাসিটেট

কার্বানায়ন

দ্বিতীয় ধাপ ঃ

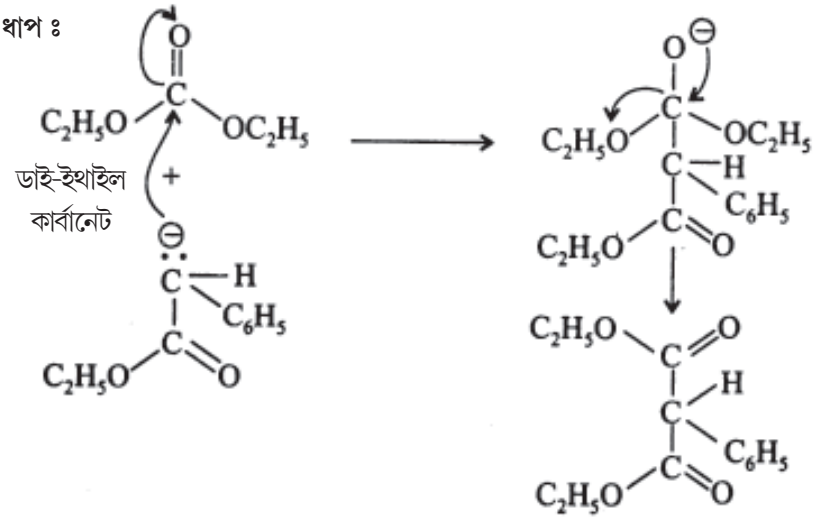

ডাই-ইথাইল
কার্বানেট

তৃতীয় ধাপ ঃ

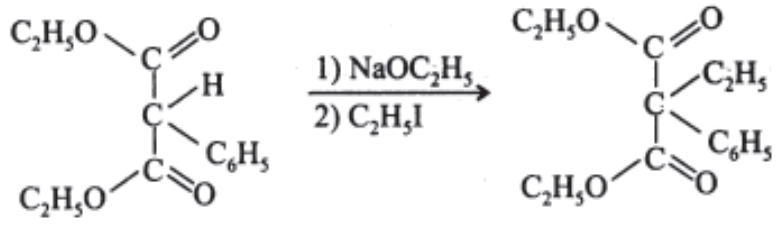

চতুর্থ ধাপ ঃ

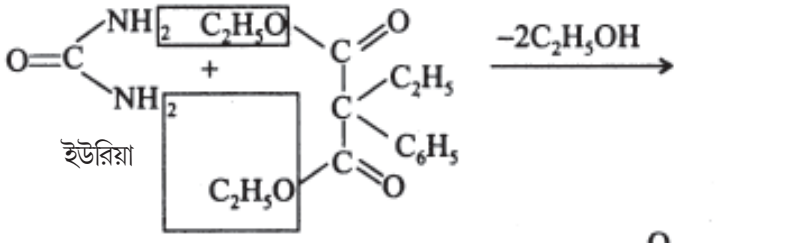

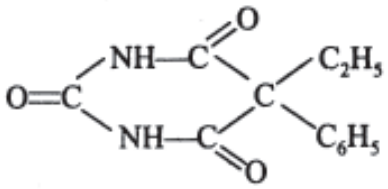

লুমিনাল

3. স্নায়বিক উত্তেজনা প্রশমনের জন্য ট্র্যাংকুয়িলাইজার (tranquilizer) ব্যবহার করা হয়। যেমন, হাইড্রালাজিন (hydralazine)।

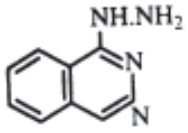

হাইড্রালাজিন

এছাড়া রিসারপিন (reserpine), মেটোপ্রোলল (metoprolol) ইত্যাদি ব্যবহৃত হয়।

4. এল. এস্. ডি. (LSD) ঃ

এই ওষুধটির রাসায়নিক নাম D-লাইসারজিক অ্যাসিড ডাই-ইথাইল অ্যামাইড বা লাইসারজাইড (D-Lysergic acid diethyl amide বা Lysergide)

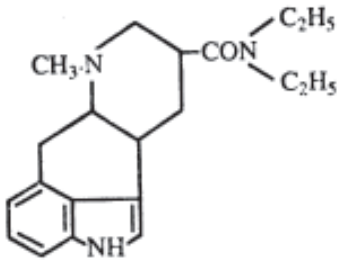

LSD

যৌগটিতে বেঞ্জিন, পিরোল, সাইক্লোহেক্সেন এবং প্রতিস্থাপিত পিরিডিন বলয় আছে। এটি একটি কঠিন যৌগ। বিশুদ্ধ কেলাসের গলনাঙ্ক 82°–85°.

অবসাদ ও হতাশা কাটাবার জন্য ভারতসহ বিভিন্ন দেশের যুবক-যুবতীরা এই ওষুধ পাউডার বা ইনজেকশন-এর মাধ্যমে ব্যবহার করছে। অনেকদিন ধরে ব্যবহার করলে এই ওষুধে আসক্তি জন্মায়। নেশাগ্রস্থ হবার ফলে ওষুধ নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। এতে শরীরের মারাত্মক ক্ষতি হয় এমনকি মৃত্যু পর্যন্ত হতে পারে। এই ধরনের ওষুধ অবশ্যই বর্জন করতে হবে।

অনুশীলনী—2

(1) একটি চর্মরোগের ওষুধের নাম লিখুন। দাঁদ সারাতে এর প্রয়োগ পদ্ধতি লিখুন।

(2) মারকিউরোক্রোম কী কাজে ব্যবহৃত হয়? এই যৌগে কি কি মৌলিক পদার্থ আছে?

(3) রিসারপিন, ভেরোনাল ও LSD কি ধরনের ওষুধ? বারবিটিউরিক অ্যাসিড প্রস্তুত করতে ব্যবহৃত দুটি কাঁচামালের নাম লিখুন।

6.1.5 অম্লনাশক ওষুধ

আমাদের পাকস্থলী থেকে প্রায় 1 *M* HCl-এর ক্ষরণ হয়। এই অবস্থায় পাকস্থলীতে ব্যাকটেরিয়া জন্মাতে পারে না এবং এন্‌জাইম সহজেই প্রোটিনের উপর বিক্রিয়া করে হজমে সাহায্য করে। কিন্তু পাকস্থলীতে খুব বেশি অ্যাসিডের ক্ষরণ ঘটলে হজমে ব্যাঘাত ঘটে।

পরিপাকক্রিয়া সুসম্পন্ন না হলে খাবার থেকে অম্ল সৃষ্টি হয়। এর ফলে পেট ফেঁপে যায়, কখনও কখনও টক টক ঢেকুর ওঠে এবং বমিও হতে পারে। এই অবস্থা থেকে পরিত্রাণ পাবার জন্য প্রচুর পরিমাণে জল পান করা উচিত। এছাড়া বিভিন্ন ধরনের অম্লনাশক ওষুধ ব্যবহার করা হয়। এই ধরনের ওষুধগুলি সবই ক্ষারজাতীয়। যেমন, অ্যালুড্রক্সে অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রক্সাইড [$Al(OH)_3$]; জেলুসিলে ম্যাগনেশিয়াম হাইড্রক্সাইড [$Mg(OH)_2$]; পলিক্রলে ম্যাগনেশিয়াম হাইড্রক্সাইড ও অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রক্সাইডের [$Mg(OH)_2 + Al(OH)_3$] মিশ্রণ থাকে। ক্ষার অম্লকে প্রশমন করে।

6.1.6 ম্যালেরিয়া প্রতিরোধী ওষুধসমূহ

স্যার রোনাল্ড রস্ ম্যালেরিয়া রোগ বিস্তারের কারণ আবিষ্কার করেন (1897). স্ত্রী অ্যানোফেলিস মশকে ম্যালেরিয়ার প্যারাসাইট, প্লাসমোডিয়াম-এর জীবন-ইতিহাস পরীক্ষা করে প্রমাণ করেছিলেন যে মশকের কামড়েই মানুষের রক্তে ম্যালেরিয়া রোগের জীবাণু প্রবেশ করে।

এই রোগ উপশমের জন্য বাজারে অনেক ধরনের ওষুধ পাওয়া যায়। এখানে তিনটি ওষুধের নাম ও গঠন-সংকেত দেওয়া হল। তিনটি ওষুধেই কুইনোলিনের গঠন বর্তমান।

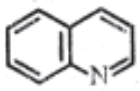

কুইনোলিন

1. কুইনিন (quinine) ঃ

সিঙ্কোনা গাছের ছাল থেকে কুইনিন সংগ্রহ করা হয়। সংগ্রহ করার পদ্ধতি নিচে সংক্ষেপে বলা হল।

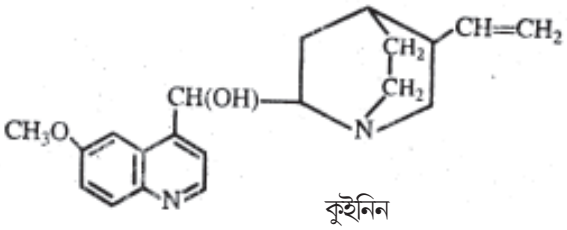

কুইনিন

নিষ্কাশন পদ্ধতি ঃ

সিঙ্কোনা গাছের ছাল থেকে প্রায় 8% কুইনিন পাওয়া যায়। গাছের ছাল শুকনো করে গুড়ো করা হয়। এই গুড়োতে ক্ষারের জলীয় দ্রবণ যোগ করা হয়। এই মিশ্রণে প্রয়োজনমত বেঞ্জিন অথবা টলুইন যোগ করে দ্রাবক-নিষ্কাশন পদ্ধতিতে (solvent extraction) উপক্ষারগুলি নিষ্কাশন করা হয়।

জৈব দ্রাবকস্তর পৃথক করে তার মধ্যে লঘু সালফিউরিক অ্যাসিড দিলে কুইনিন, সিঙ্কোনিন প্রভৃতি উপক্ষারের সালফেট লবণ উৎপন্ন হয়। এই আম্লিক দ্রবণকে পৃথক করে আবার ক্ষারের সাহায্যে প্রশমিত করলে কুইনিন সালফেট অধঃক্ষিপ্ত হয়। হাইড্রোক্লোরাইড অথবা সালফেট লবণ হিসাবে কুইনিন ব্যবহৃত হয়।

ধর্ম ঃ

কুইনিন ওষুধটি অত্যন্ত তেতো। কেলাসিত কুইনিনের গলনাঙ্ক প্রায় 177°–178°. কুইনিন উপক্ষার জলে প্রায় অদ্রাব্য।

2. ক্লোরোকুইন (chloroquine) ঃ

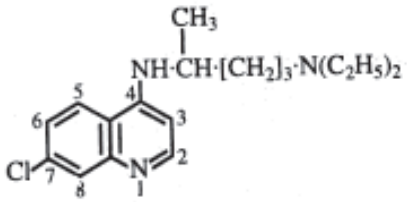

ক্লোরোকুইন

[7-ক্লোরো-4 (4-ডাই-ইথাইল অ্যামিনো-1-মিথাইল বিউটাইল অ্যামিনো) কুইনোলিন]

কুইনিনের মতই ওষুধটি তেঁতো। ক্লোরোকুইন ডাইফসফেট সাদা পাউডার হিসাবে পাওয়া যায় ও জলে দ্রাব্য। গলনাঙ্ক প্রায় 210°.

ম্যালেরিয়ার ওষুধ হিসাবে ক্লোরোকুইন, কুইনিন থেকে অধিক কার্যকর। ম্যালেরিয়ার প্যারাসাইট ধ্বংস করতে প্রায় 1.4–1.5 গ্রা ক্লোরোকুইনের প্রয়োজন হয়।

3. পামাকুইন (pamaquine) ঃ

ম্যালেরিয়ার হাত থেকে রেহাই পাবার আরও একটি ওষুধ হল পামাকুইন। ক্লোরোকুইনের সঙ্গে পামাকুইনের তফাৎ হল, পামাকুইনে প্রতিস্থাপিত অ্যামিন মূলকটি কুইনোলিন বলয়ের 8 নং

কার্বনের সঙ্গে যুক্ত। এতে ক্লোরিন অনুপস্থিত; কিন্তু 6 নং কার্বনের সঙ্গে একটি মিথক্সি মূলক যুক্ত আছে। পামাকুইনের রাসায়নিক গঠন নীচে দেখান হল।

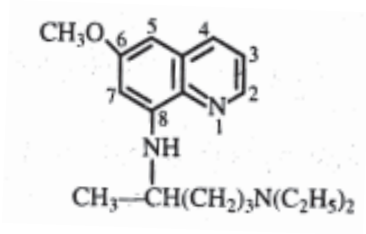

পামাকুইন

6.1.7 অ্যামিবোয়িক ও ব্যাসিল্যারি আমাশয় রোগের উপশমের জন্য ওষুধ

1. এন্টারকুইনল (enteroquinol) অ্যামিবোয়িক আমাশয়ের জন্য এই ওষুধটি খুবই কার্যকর।

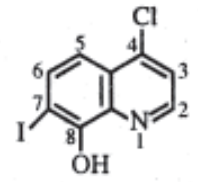

এন্টারকুইনল
[4-ক্লোরো-7-আয়োডা-8-অক্সিকুইনলিন]

অধিক পরিমাণে ব্যবহার করলে দৃষ্টিশক্তির ক্ষতি হবার সম্ভাবনা থাকে। তাই WHO এই ওষুধটি প্রস্তুতির উপর নিষেধাজ্ঞা জারি করেছে। কিন্তু এন্টারজাইম হিসাবে পাওয়া যায়।

2. সালফাগুয়ানিডিন (sulphaguanidine) ব্যাসিলারি আমাশয়ের ওষুধ হিসাবে ব্যবহৃত হয়। [এই ওষুধের রাসায়নিক গঠন 6.1.9-এ দেখানো হয়েছে।]

অনুশীলনী—3

(1) পাকস্থলীতে বেশি অ্যাসিডের ক্ষরণ ঘটলে কি অসুবিধার সৃষ্টি হয়? দুটি অম্লনাশক ওষুধের নাম লিখুন।

(2) কুইনিন কোথা থেকে সংগ্রহ করা হয়? কুইনিন ও ক্লোরোকুইনের মধ্যে কোনটি ম্যালেরিয়ার ওষুধ হিসাবে বেশি কার্যকর?

(3) আমাশয়ের জন্য ব্যবহৃত একটি ওষুধের নাম লিখুন যাতে কুইনলিন বলয় আছে।

6.1.8 অ্যান্টিবায়টিক ওষুধসমূহ

নীচে কয়েকটি অ্যান্টিবায়টিক ওষুধের নাম, আবিষ্কর্তার নাম, রাসায়নিক গঠন এবং কোন্ অসুখের জন্য ব্যবহার করা হয় তার উল্লেখ করা হল। 1942 সালে Waksman প্রথম অ্যান্টিবায়টিক শব্দটি ব্যবহার করেন।

1. পেনিসিলিন জি. (penicillin G) ঃ

ওষুধটির রাসায়নিক গঠন নীচে দেখান হল ঃ

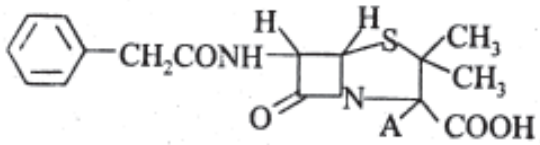

1929 সালে আলেকজান্ডার ফ্লেমিং পেনিসিলিন আবিষ্কার করেন। এই ওষুধটি জীবাণুনাশক এবং সংক্রমক রোগের হাত থেকে রক্ষা পাবার জন্য ব্যবহার করা হয়।

2. স্ট্রেপটোমাইসিন (streptomycin) ঃ

ওষুধটির রাসায়নিক গঠন এরূপ।

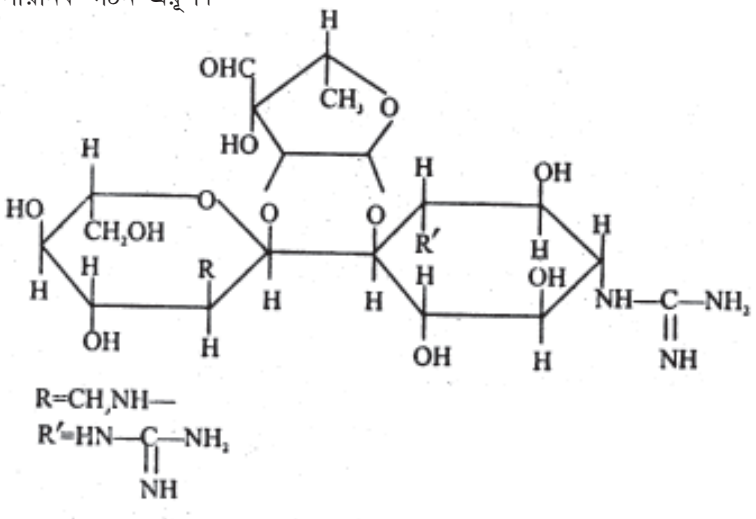

এই ওষুধ যক্ষ্মা, মেনিনজাইটিস ও নিমোনিয়া রোগ নিবারণের জন্য ব্যবহৃত হয়।

3.ক্লোরোমাইসেটিন বা ক্লোরামফিনিকল

(chloromycetin or chloramphenicol) ঃ

এই ওষুধটির রাসায়নিক গঠন নীচে দেখান হল

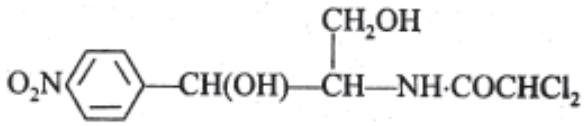

Carter ও সহকর্মীবৃন্দ 1948 সালে এটি আবিষ্কার করেন।

এই ওষুধটি টাইফয়েড বা প্যারাটাইফয়েড রোগের চিকিৎসার জন্য ব্যবহার করা হয়।

6.1.9 সালফোনামাইড ওষুধসমূহ

সালফোনামাইড ওষুধগুলি নাইট্রোজেন ও সালফার ঘটিত অ্যামাইড জাতীয় জৈব যৌগ। এই ওষুধগুলি সংক্রমক রোগ নিরসনের জন্য ব্যবহৃত হয়। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল

1. সালফানিলামাইড
2. সালফাপিরিডিন
3. সালফাডায়াজোল
4. সালফাডায়াজিন
5. সালফাগুয়ানিডিন

নীচে এই ওষুধগুলির রাসায়নিক গঠন, প্রস্তুতি ও ব্যবহার সংক্ষেপে উল্লেখ করা হল।

1.সালফানিলামাইড (sulphanilamide) ঃ

গঠন ঃ

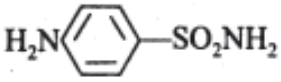

প্রস্তুতি ঃ

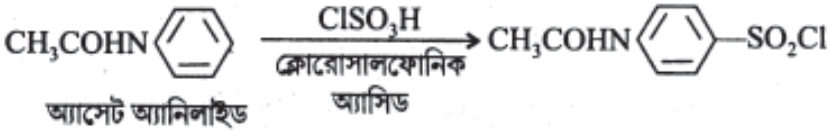

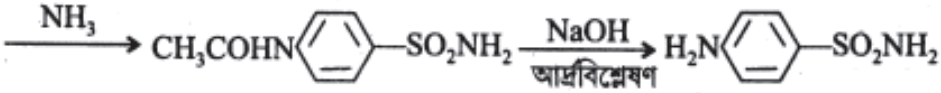

ব্যবহার ঃ কক্কাই-সংক্রমণ যেমন—

স্ট্রেপটোকক্কাই (streptococci), গনোকক্কাই (gonococci) এবং নিমোনোকক্কাই (pneumonococci) প্রভৃতি সংক্রমক রোগের জন্য ব্যবহৃত হয়।

2. সালফাপিরিডিন (supphapyridine) ঃ

গঠন ঃ

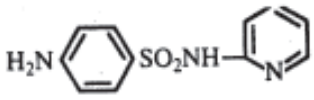

প্রস্তুতি ঃ

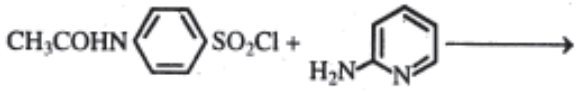

2-অ্যামিনো পিরিডিন

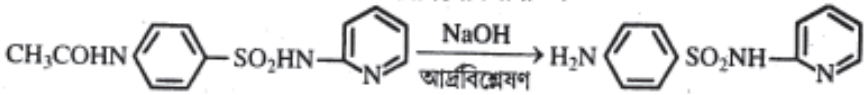

ব্যবহার ঃ নিমোনিয়ার ওষুধ হিসাবে প্রথম ব্যবহৃত হয়। সালফানিলামাইড থেকে অধিক কার্যকরী।

3.সালফাথায়াজোল (sulphathiazole) ঃ

গঠন ঃ

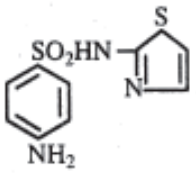

প্রস্তুতি ঃ

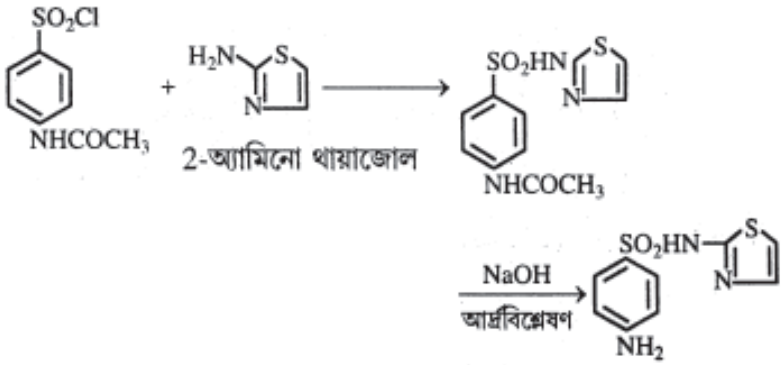

ব্যবহার ঃ নিমোনিয়ার ওষুধ। সালফাপিরিডিন থেকে বেশি কার্যকরী।

4. সালফাডায়াজিন (sulphadiazine) ঃ

গঠন ঃ

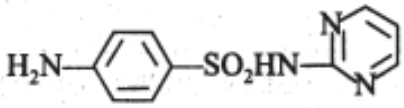

প্রস্তুতি ঃ

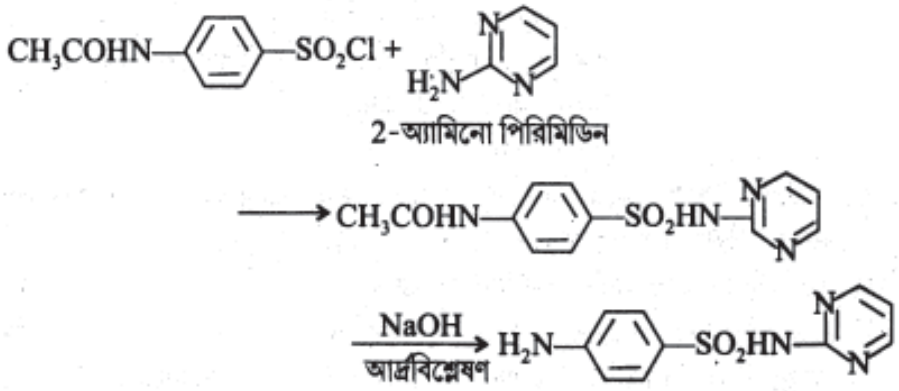

ব্যবহার ঃ মৃদু সংক্রমণের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হয়।

5.সালফাগুয়ানিডিন (sulphaguanidine) ঃ

গঠন ঃ

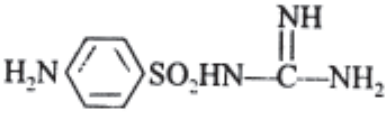

প্রস্তুতি ঃ

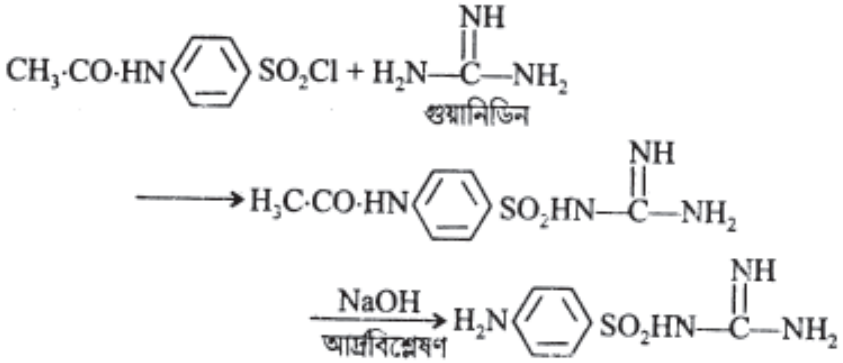

ব্যবহার ঃ এই ওষুধ ব্যাসিলারি আমাশয় থেকে নিরাময়ের জন্য ব্যবহৃত হয়।

6.2 সারাংশ

এই এককটি পাঠ করে আপনি যে তথ্য জানতে পেরেছেন সেগুলির সার-সংক্ষেপ হল ঃ

- ওষুধের শ্রেণীবিভাগ কি ভিত্তিতে করা হয়েছে
- জ্বর, ব্যথা-বেদনা প্রশমনের জন্য কি ধরনের ওষুধ ব্যবহার করা হয়—যেমন, জ্বরের জন্য প্যারাসিটামল; মাথা ধরার জন্য অ্যাসপিরিন, ব্যথার জন্য আয়োডেক্স, ইউথেরিয়া প্রভৃতি ব্যবহার করি
- চর্মরোগ—বিশেষ করে দাঁদজাতীয় রোগের জন্য স্যালিসাইলিক অ্যাসিড সম্পৃক্ত অ্যালকোহলীয় দ্রবণের ব্যবহার
- মারকিউরোক্রোম একটি পচন নিবারক ওষুধ
- চেতনানাশক ও স্নায়বিক উত্তেজনা হ্রাসের ওষুধ হিসাবে ভেরোনাল, লুমিনাল, হাইড্রালজিন, রিসারপিন ইত্যাদির ব্যবহার ও LSD-র অপকারিতা
- অম্লনাশক ওষুধের প্রকৃতি কি

- ম্যালেরিয়ার ওষুধ ও এদের চরিত্রগত বৈশিষ্ট্য কি? সিঙ্কোনা গাছ থেকে কিভাবে কুইনিন সংগ্রহ করা হয়
- অ্যামিবোয়িক ও ব্যাসিল্যারি আমাশয়ে ব্যবহৃত ওষুধের নাম ও রাসায়নিক গঠন
- অ্যান্টিবায়োটিক ওষুধ—যেমন পেনিসিলিন, স্ট্রেপটোমাইসিন, ক্লোরাম-ফিনিকল—এদের রাসায়নিক গঠন ও ব্যবহার
- সালফোনামাইড ওষুধ কোনগুলি এদের নাম, রাসায়নিক গঠন, প্রস্তুতি ও ব্যবহার।

6.3 সর্বশেষ প্রশ্নাবলি

1. প্যারাসিটামল যৌগটির রাসায়নিক গঠন লিখুন। ওষুধ হিসাবে এটির একটি প্রয়োগ উল্লেখ করুন। *p*-নাইট্রোক্লোরোবেঞ্জিন থেকে প্যারাসিটামলের প্রস্তুতি লিখুন (শুধু বিক্রিয়া উল্লেখ করুন)।
2. মিথাইল স্যালিসাইলেট কিভাবে প্রস্তুত করবেন? এই ওষুধটির উপকারিতা লিখুন।
3. LSD ওষুধটির রাসায়নিক নাম কি? এই ওষুধটি কেন ব্যবহার করা হয় এবং বেশিদিন ব্যবহার করলে কি ঘটে?
4. ম্যালেরিয়া প্রতিরোধকারী দুটি ওষুধের নাম লিখুন। সিঙ্কোনা গাছের ছাল থেকে কিভাবে কুইনিন নিষ্কাশন করা হয়?
5. যক্ষ্মা, টাইফয়েড, নিমোনিয়া ও ব্যাসিল্যারি আমাশয় নিরাময়ের জন্য একটি করে ওষুধের নাম লিখুন।
6. সালফানিলামাইড এবং সালফাডায়াজিন কিভাবে প্রস্তুত করবেন? (শুধু রাসায়নিক সমীকরণ লিখুন)।

6.4 উত্তরমালা

অনুশীলনী—1

(1) প্যারাসিটামল; C, H, O ও N; সংকেত $C_8H_9O_2N$

(2) মাথাধরা, দাঁত ব্যাথা ইত্যাদি। গঠন-সংকেত ঃ

অনুশীলনী—2

(1) 6.1.2 দেখুন।

(2) 6.1.3 দেখুন।

মৌলের নাম—C, H, O, Br ও Hg

(3) 6.1.4 দেখুন।

অনুশীলনী—3

(1) 6.1.5 দেখুন।

(2) 6.1.6 দেখুন।

(3) এন্টারকুইনল।

সর্বশেষ প্রশ্নাবলি

(1)

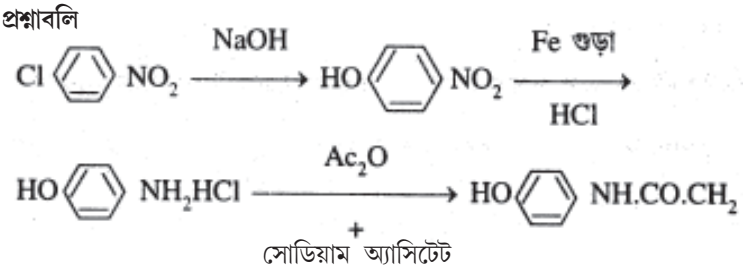

(2) 6.1.1 এবং 3নং উদাহরণ দেখুন।

(3) 6.1.4 এর 4নং উদাহরণ দেখুন।

(4) 6.1.6 দেখুন।

(5) যক্ষ্মা—স্ট্রেপটোমাইসিন

টাইফয়েড—ক্লোরামফিনিকল

নিমোনিয়া—স্ট্রেপটোমাইসিন, সালফাপিরিডিন

ব্যাসিল্যারি আমাশয়—সালফাগুয়ানিডিন

References :

(1) Organic Chemistry (Vols. I & II)—I. L. Finar
(2) Organic Chemistry (Vols. I & II)—S. M. Mukherjee, S. P. Singh & R. P. Kapoor.
(3) Advanced Organic Chemistry—B. S. Bahl & A. Bahl.
(4) Principles of Organic Synthetis—R. O. C. Norman.
(5) Organic Chemistry—R. T. Morrison & R. N. Boyd.

একক 7 □ চর্বি ও তেল (Fats and Oils)

গঠন

7.0 প্রস্তাবনা

উদ্দেশ্য

7.1 চর্বি ও তেলের রাসায়নিক প্রকৃতি

7.1.1 উদ্ভিজ্জ তেলের সঙ্গে খনিজ তেলের পার্থক্য

7.2 খাদ্য তালিকায় চর্বি ও তেলের প্রয়োজনীয়তা

7.2.1 খাদ্যের উপযোগী / অনুপযোগী চর্বি ও তেল

7.3 প্রাকৃতিক উৎস থেকে তেল নিষ্কাশন

7.3.1 অশোধিত তেলের শোধন প্রক্রিয়া

7.4 প্রাণিজ চর্বি কঠিন এবং উদ্ভিজ্জ তেল তরল কেন

7.5 চর্বি ও তেলের রাসায়নিক গঠন

7.5.1 নামকরণ

7.5.2 ভৌত ধর্ম

7.5.3 রাসায়নিক ধর্ম

7.6 চর্বি ও তেলে বিভিন্ন সম্পৃক্ত ও অসম্পৃক্ত অ্যাসিডের শতকরা হার

7.7 চর্বি ও তেলের রাসায়নিক বিশ্লেষণ

7.8 উদ্ভিজ্জ তেল থেকে বনস্পতি তৈরির শিল্প-পদ্ধতি

7.9 চর্বি ও তেল সম্বন্ধে বিশেষ সংযোজন

7.10 সারাংশ

7.11 সর্বশেষ প্রশ্নাবলি

7.12 উত্তরমালা

7.0 প্রস্তাবনা

আমরা বেঁচে থাকার জন্য যে খাদ্য প্রতিদিন গ্রহণ করে থাকি তার মধ্যে প্রধান তিন শ্রেণীর খাদ্য হল প্রোটিন, শর্করা এবং চর্বি ও তেল। প্রোটিন যেমন শরীর গঠনের (body building) জন্য প্রয়োজন, তেমনি শক্তি উৎপাদনের জন্য প্রয়োজন শর্করা এবং চর্বি ও তেল (energy food) জাতীয় খাদ্য।

খাদ্য পরিপাকের ফলে শর্করা এবং চর্বি ও তেল থেকে যে শক্তি উৎপন্ন হয় তা কেবলমাত্র আমাদের দৈনন্দিন কাজকর্মের প্রেরণাই যোগায় না আমাদের দেহের অনুকূল তাপমাত্রাও সর্বদা বজায় রাখে।

চর্বি ও তেল যে শুধু মানুষের প্রধান খাদ্য তালিকাতেই স্থান করে নিয়েছে তাই নয়, এই শ্রেণীর জৈব যৌগের শিল্পেও প্রচুর চাহিদা রয়েছে। যেমন—সাবান শিল্পে, গ্লিসারিন তৈরি করতে, শুষ্ক তেল (drying oil) প্রস্তুতিতে বা লিনোলিয়াম অয়েল ক্লথ (oil cloth) ইত্যাদি তৈরির জন্য ব্যবহার করা হয়।

চর্বি, তেল ও মোম উদ্ভিজ্জ ও প্রাণীজ উৎস থেকে প্রচুর পরিমাণে সংগ্রহ করা হয়। প্রাকৃতিক উৎস থেকে প্রাপ্ত এই শ্রেণীর জৈব পদার্থগুলিকে 'লিপিড' (lipid) বলে। গ্রীক ভাষায় 'লিপিড' শব্দের অর্থ হল চর্বি। যে লিপিডসমূহ অ্যাসিডের উপস্থিতিতে আর্দ্রবিশ্লেষিত হয়ে ফ্যাটি অ্যাসিড ও অ্যালকোহল উৎপন্ন করে তাদের 'সরল লিপিড' বলে। এই সরল লিপিডসমূহকে আবার দুটি ভাগে ভাগ করা যায়—

চর্বি ও তেল ঃ এইগুলি আর্দ্রবিশ্লেষিত হয়ে দীর্ঘ শৃঙ্খলযুক্ত ফ্যাটি অ্যাসিড ও 'গ্লিসারল' উৎপন্ন করে।

মোম ঃ এইগুলি আর্দ্রবিশ্লেষিত হয়ে দীর্ঘ শৃঙ্খলযুক্ত ফ্যাটি অ্যাসিড ও দীর্ঘ শৃঙ্খলযুক্ত মনোহাইড্রিক অ্যালকোহল উৎপন্ন করে।

উপরের আলোচনা থেকে এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যে চর্বি, তেল ও মোম রাসায়নিক জৈব 'এস্টার' শ্রেণীর যৌগ। ফ্যাটি অ্যাসিড ছাড়া চর্বি ও তেলে থাকে গ্লিসারল; আর মোমে থাকে দীর্ঘ শৃঙ্খলযুক্ত মনোহাইড্রিক অ্যালকোহল।

উদ্দেশ্য :

এই এককটি পাঠের পর আপনি যা শিখতে পারবেন তা হল ঃ

- চর্বি ও তেল কোন্ শ্রেণীর জৈব যৌগ এবং এদের প্রাকৃতিক উৎস কি
- উদ্ভিজ্জ তেল/প্রাণিজ চর্বি বা তেলের সঙ্গে খনিজ তেলের পার্থক্য কোথায়
- আমাদের খাদ্য তালিকায় চর্বি ও তেলের প্রয়োজন কেন? কোন্ কোন্ তেল আমাদের খাদ্যের উপযোগী এবং কোন্ কোন্ তেল খাদ্যের উপযোগী নয়
- বিভিন্ন প্রাকৃতিক উৎস থেকে উৎপন্ন তেলের মধ্যে মিল বা অমিল কোথায়
- প্রাকৃতিক উৎস থেকে তেলের নিষ্কাশন পদ্ধতিসমূহ
- অশোধিত চর্বি বা তেলের শোধন করার পদ্ধতি
- প্রাণিজ চর্বি সাধারণত কঠিন এবং উদ্ভিজ্জ তেল তরল কেন
- চর্বি ও তেলের রাসায়নিক গঠন ও নামকরণ
- ভৌত ধর্ম ও রাসায়নিক বিক্রিয়া
- তেল থেকে বনস্পতি প্রস্তুতকরণ
- চর্বি ও তেলের রাসায়নিক বিশ্লেষণ—সাবানীভবন মান (saponification value), আয়োডিন মান (iodine value), অম্লমান (acid value) প্রভৃতি বলতে কী বোঝায়
- চর্বি ও তেল দীর্ঘদিন বায়ুর সংস্পর্শে রাখলে দুর্গন্ধ (rancid) হয় কেন

7.1 চর্বি ও তেলের রাসায়নিক প্রকৃতি

প্রাণিজ চর্বি ও উদ্ভিজ্জ তেল 'এস্টার' শ্রেণীর জৈব যৌগ। জৈব অ্যাসিড ও অ্যালকোহলের রাসায়নিক বিক্রিয়ায় 'এস্টার' ও জল উৎপন্ন হয়।

অজৈব অ্যাসিড + ক্ষার = লবণ + জল

সাধারণ তাপমাত্রায় এস্টার যৌগ যখন কঠিন অবস্থায় থাকে তখন তাকে বলা হয় চর্বি, আর যখন তরল অবস্থায় থাকে বলা হয় তেল। নারকেল তেল শীতকালে কঠিন (চর্বি) এবং গ্রীষ্মকালে তরল (তেল) অবস্থায় থাকে। অর্থাৎ চর্বি কম গলনাঙ্ক বিশিষ্ট কঠিন পদার্থ।

7.1.1 উদ্ভিজ্জ তেলের (vegetable oil) সঙ্গে খনিজ তেলের (mineral oil) পার্থক্য

উপরে উল্লেখ করা হয়েছে যে চর্বি ও তেল জৈব 'এস্টার' শ্রেণীর যৌগ। এই যৌগগুলি কার্বন, হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন (C, H, O) মৌলিক উপাদান দিয়ে গঠিত।

কিন্তু খনিজ তেল [পেট্রোলিয়াম] মূলতঃ 'হাইড্রোকার্বন' শ্রেণীর জৈব যৌগ। অর্থাৎ খনিজ তেল শুধু কার্বন ও হাইড্রোজেন (C, H) মৌলিক উপাদান দিয়ে গঠিত।

7.2 খাদ্য তালিকায় চর্বি ও তেলের প্রয়োজনীয়তা

আমাদের শরীর ধারণের জন্য বিভিন্ন প্রকার খাদ্যের প্রয়োজন। যেমন—প্রোটিন, শর্করা, চর্বি ও তেল, ভিটামিন ও খনিজ লবণ। প্রোটিন শরীর গঠনের জন্য প্রয়োজন আবার শর্করা, চর্বি ও তেলের পরিপাক ক্রিয়ার ফলে শক্তি উৎপন্ন হয়। এই শক্তিই আমাদের দৈনন্দিন কাজ করার ক্ষমতার উৎস এবং আমাদের দেহের তাপমাত্রা বজায় রাখে।

প্রোটিন—C, H, O, N মৌলিক পদার্থ নিয়ে গঠিত

খাদ্য পরিপাকের ফলে তিন শ্রেণীর প্রধান খাদ্য থেকে যে শক্তি উৎপন্ন হয় তা সারণী—1 এ উল্লেখ করা হল ঃ

সারণী—1

প্রধান খাদ্যের নাম (প্রতি গ্রাম)	উৎপন্ন শক্তির পরিমাণ (কি. জুল)
প্রোটিন	16.74
শর্করা	23.01
চর্বি বা তেল	33.50

7.2.1 খাদ্যের উপযোগী/অনুপযোগী চর্বি ও তেল

প্রাকৃতিক উৎস থেকে প্রাপ্ত সমস্ত তেলই খাবার উপযুক্ত নয়। খাবার উপযুক্ত কয়েকটি তেলের (edible oil) নাম সারণী—2a তে উল্লেখ করা হল ঃ

সারণী—2a

ক্রমিক সংখ্যা	তেলের নাম
1	সর্ষের তেল (mustard oil)
2	নারকেল তেল (coconut oil)
3	সয়াবিন তেল (soyabean oil)
4	ধানের তুষের তেল (rice oil)
5	বাদাম তেল (groundnut oil)
6	পাম তেল (palm oil)
7	সূর্যমুখী তেল (sunflower oil)
8	রেপসীড তেল (rapeseed oil)

আর যে তেলসমূহ খাবার উপযুক্ত নয় (inedible oil) সে রকম কয়েকটি তেলের নাম সারণী—2b তে দেওয়া হল ঃ

সারণী—2b

ক্রমিক সংখ্যা	তেলের নাম
1	মশিনাবীজ তেল (linseed oil)
2	তুলাবীজ তেল (cottonseed oil)
3	রেড়ির তেল (castor oil)
4	তিল তেল (sesame oil)

7.3 প্রকৃতিক উৎস থেকে তেল নিষ্কাশন

এখানে উদ্ভিজ্জ তেল সম্বন্ধেই আমাদের আলোচনা সীমাবদ্ধ রাখব।

সরষের দানা থেকে সরষের তেল নিষ্কাশন পদ্ধতি সম্বন্ধে আমাদের অনেকেরই অল্পবিস্তর ধারণা আছে। গ্রামাঞ্চলে গরুর সাহায্যে টানা কাঠের তৈরি পেষণযন্ত্রে ব্যবহৃত সরষে পিষে তেল নিষ্কাশন করা হয়। যখন তেলের মিলের প্রাচুর্য ছিল না তখন চাষীদের কাছে এটিই একমাত্র সহায়ক পদ্ধতি ছিল। এই পদ্ধতিতে বিশুদ্ধ সরষের তেল পাওয়া যেত ঠিকই, কিন্তু ব্যবহৃত সরষের তুলনায় প্রাপ্ত তেলের পরিমাণ খুবই কম হত। তাছাড়া প্রচুর সময়ের অপব্যবহার হত। তেল নিষ্কাশনের পরে যে 'কেক' পাওয়া যায় তাকে 'খইল' (চলিত কথায় খোল) বলে। এই খইল গরুর জন্য পুষ্টিকর খাদ্য হিসাবে ব্যবহৃত হয়। এই 'খইলে' প্রচুর পরিমাণে নাইট্রোজেন থাকে। তাই জমিতে সার হিসাবেও এই খইল ব্যবহৃত হয়। এই পদ্ধতিতে প্রাপ্ত তেলকে ঘানির (ghani) তেল বলা হয়।

সরষের অপচয় হয় বলে এখন তেলের মিলে স্টিলের তৈরি রোলারে তড়িৎশক্তির ব্যবহার করে সরষের দানা পেষণ করে তেল সংগ্রহ করা হয়।

তেল সংগ্রহ করার পর প্রাপ্ত 'কেক' বা 'খইলে' প্রায় 3-4% তেল থেকে যায়। কেক থেকে এই অবশিষ্ট তেল দ্রাবক (পেট্রোলিয়াম ইথার) ব্যবহার করে এবং পরে আংশিক পাতনের সাহায্যে দ্রাবক দ্রবীভূত করে সংগ্রহ করা যেতে পারে।

এই উন্নত পদ্ধতিতে বাদাম তেল, সূর্যমুখী তেল, নারকেল তেল, সয়াবিন তেল প্রভৃতি পাওয়া যেতে পারে। মাখী সরষেই রেপসীড। ঐ তেলও এভাবে পাওয়া যায়।

7.3.1 অশোধিত তেলের শোধন প্রক্রিয়া

উপরের পদ্ধতিতে প্রাপ্ত তেলে অনেক অপদ্রব্য থাকে। এই অপদ্রব্যগুলি ভাসমান ও কলয়েডাল দুরকমই হতে পারে। এছাড়া মুক্ত অ্যাসিড থাকতে পারে এবং তেলে অবাঞ্ছিত রঙ ও গন্ধও থাকতে পারে।

তেল থেকে এই অপদ্রব্যগুলি অপসারণের জন্য নিচের পদ্ধতিগুলি ধাপে ধাপে প্রয়োগ করা হয়।

(1) অদ্রাব্য ভাসমান ও কলয়েড পদার্থ দূরীকরণ ঃ

সাইট্রিক অ্যাসিডের উপস্থিতিতে স্টীম প্রয়োগ করলে কলয়েড দ্রব্যগুলি জমাট বেধে যায়। এগুলি এবং ভাসমান পদার্থগুলি পরিস্রাবণ পদ্ধতির সাহায্যে দূরীভূত করা হয়।

(2) মুক্ত অ্যাসিড দূরীকরণ ঃ

তেল উত্তপ্ত করে ক্ষারের সাহায্যে মুক্ত অ্যাসিড প্রথমে প্রশমিত করা হয়। এই প্রশমন ক্রিয়ার ফলে সাবান উৎপন্ন হয়। ঠাণ্ডা করলে সাবান জল পাত্রের তলায় জমা হয়। পরে নির্গম নলের সাহায্যে এই অপদ্রব্য দূর করা হয়। পরে জল দিয়ে তেল ধুয়ে নিয়ে ধৌত জল অপসারণের পর বায়ুশূন্য পাত্রে উত্তপ্ত করে তৈল শুষ্ক করা হয়।

(3) রঙ ও গন্ধ দূরীকরণ পদ্ধতি ঃ

উপরের পদ্ধতিতে শোধনের পরেও তেলে অবাঞ্ছিত রঙ ও গন্ধ কিছু থেকে যায়। এবার সাজিমাটির সাহায্যে তেলের অবশিষ্ট রঙ ও গন্ধ দূর করা হয়। এরপর পরিস্রাবণ প্রক্রিয়ার সাহায্যে বিশুদ্ধ তেল সংগ্রহ করা হয়।

7.4 প্রাণিজ চর্বি কঠিন এবং উদ্ভিজ্জ তেল তরল কেন

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে চর্বি ও তেল এস্টার শ্রেণীর জৈব যৌগ। এই এস্টারগুলি গ্লিসারল এবং দীর্ঘ শৃঙ্খলযুক্ত ফ্যাটি অ্যাসিডের রাসায়নিক বিক্রিয়ায় উৎপন্ন হয়েছে। এদের 'গ্লিসারাইড' বলে। ফ্যাটি অ্যাসিড সম্পৃক্ত ও অসম্পৃক্ত দুইই হতে পারে। অসম্পৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিডে এক বা একাধিক অসম্পৃক্ততা (দ্বিবন্ধন) থাকতে পারে।

প্রাণিজ চর্বির গ্লিসারাইডের সম্পৃক্ত অ্যাসিডের (মিরিস্টিক, পামিটিক, স্টিয়ারিক প্রভৃতি সম্পৃক্ত অ্যাসিড) পরিমাণ বেশি থাকায় চর্বি সাধারণ তাপমাত্রায় কঠিন। কিন্তু উদ্ভিজ্জ তেলের গ্লিসারাইডে অসম্পৃক্ত অ্যাসিডের (ওলেইক অ্যাসিডে **একটি** দ্বিবন্ধন, লিনোলেইক অ্যাসিডে **দুটি**

দ্বিবন্ধন এবং লিনোলেনিক অ্যাসিডে **তিনটি** দ্বিবন্ধন আছে) পরিমাণ বেশি থাকায় তেল সাধারণ তাপমাত্রায় তরল।

7.5 চর্বি ও তেলের রাসায়নিক গঠন

প্রাকৃতিক উৎস থেকে প্রাপ্ত চর্বি ও তেলের গ্লিসারাইডে যে ফ্যাটি অ্যাসিড থাকে তাতে জোড় সংখ্যক কার্বন পরমাণু বর্তমান। এক অণু গ্লিসারল তিন অণু ফ্যাটি অ্যাসিডের সঙ্গে বিক্রিয়া করে তিন অণু জলসহ এক অণু গ্লিসারাইড উৎপন্ন করে। এই জন্য এদের বলা হয় 'ট্রাইগ্লিসারাইড' (triglyceride)।

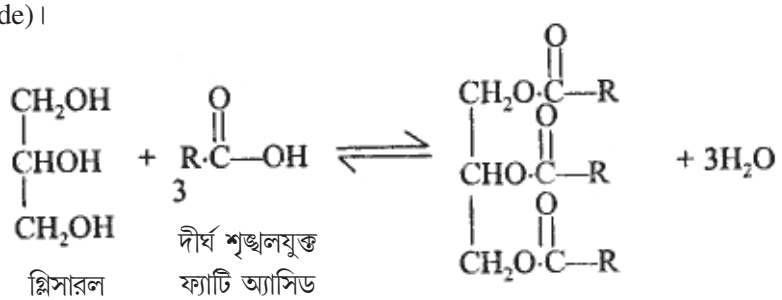

গ্লিসারল　　দীর্ঘ শৃঙ্খলযুক্ত ফ্যাটি অ্যাসিড　　ট্রাইগ্লিসারাইড

যে সকল গ্লিসারাইডে তিনটি ফ্যাটি অ্যাসিডের অণু একইরকম তাদের সরল (simple) গ্লিসারাইড বলে। আর যে সকল গ্লিসারাইডে ফ্যাটি অ্যাসিডের অণুগুলি একরকম নয় তাদের মিশ্র (mixed) গ্লিসারাইড বলে। দুই শ্রেণীর গ্লিসারাইডের নির্দিষ্ট উদাহরণ দেওয়া হল।

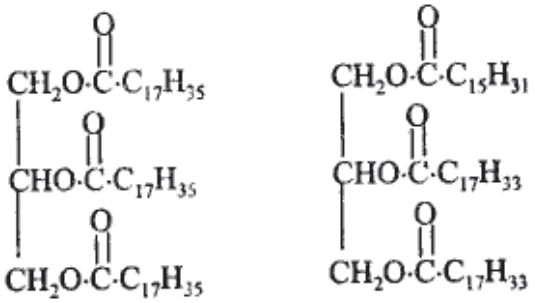

সরল গ্লিসারাইড　　মিশ্র গ্লিসারাইড

প্রকৃতিতে সাধারণত মিশ্র গ্লিসারাইডের আধিক্য দেখা যায়।

গ্লিসারাইডে উপস্থিত কয়েকটি প্রধান সম্পৃক্ত এবং কয়েকটি প্রধান অসম্পৃক্ত অ্যাসিডের নাম 7.4 এ উল্লেখ করা হয়েছে। এই অ্যাসিডগুলির রাসায়নিক গঠন সারণী—3a এবং সারণী—3b তে দেখান হল।

সারণী—3a

সম্পৃক্ত অ্যাসিডের নাম	রাসায়নিক গঠন
লরিক অ্যাসিড (lauric acid) $C_{11}H_{23}COOH$	$CH_3(CH_2)_{10}COOH$
মিরিস্‌টিক অ্যাসিড (myristic acid) $C_{13}H_{27}COOH$	$CH_3(CH_2)_{12}COOH$
পামিটিক অ্যাসিড (palmitic acid) $C_{15}H_{31}COOH$	$CH_3(CH_2)_{14}COOH$
স্টিয়ারিক অ্যাসিড (stearic acid) $C_{17}H_{35}COOH$	$CH_3(CH_2)_{16}COOH$

সারণী—3b

অসম্পৃক্ত অ্যাসিডের নাম	রাসায়নিক গঠন
ওলেইক অ্যাসিড (oleic acid) $C_{17}H_{33}COOH$	$CH_3(CH_2)_7CH{=}CH(CH_2)_7COOH$
লিনোলেইক অ্যাসিড (linoleic acid) $C_{17}H_{31}COOH$	$CH_3(CH_2)_4CH{=}CH{\cdot}CH_2CH{=}CH{\cdot}(CH_2)_7COOH$
লিনোলেনিক অ্যাসিড (linolenic acid) $C_{17}H_{29}COOH$	$CH_3CH_2CH{=}CH{\cdot}CH_2CH{=}{=}CH{\cdot}CH_2CH{=}CH{\cdot}(CH_2)_7{\cdot}COOH$

7.5.1 নামকরণ

গ্লিসারাইডে কোন্ ফ্যাটি অ্যাসিড (বা কোন্ কোন্ ফ্যাটি অ্যাসিড) উপস্থিত আছে তার উপর ভিত্তি করে গ্লিসারাইডের নামকরণ করা হয়। অ্যাসিডের নামের শেষে 'ইক্' (ic) এর পরিবর্তে গ্লিসারাইডের নামের শেষে ইন্ (in) যোগ করা হয়। যেমন,

$CH_2O.CO.C_{17}H_{35}$
|
$CHO.COC_{17}H_{35}$
|
$CH_2OCOC_{17}H_{35}$

ট্রাইস্টিয়ারিন
(tristearin)

এখানে দীর্ঘ শৃঙ্খল অ্যাসিড হল স্টিয়ারিক অ্যাসিড

$CH_2O.CO.C_{15}H_{31}$
|
$CHO.COC_{17}H_{31}$
|
$CH_2O.CO.C_{17}H_{31}$

α-পামিটো-α' : β-ডাই-লিনোলেইন

এখানে ফ্যাটি অ্যাসিড দুটি ঃ একটি হল পামিটিক অ্যাসিড; অন্য দুটি হল লিনোলেইক অ্যাসিড।

7.5.2 ভৌত ধর্ম

সাধারণ তাপমাত্রায় প্রাণিজ চর্বি কঠিন ও উদ্ভিজ্জ তেল তরল অবস্থায় থাকে। চর্বির গলনাঙ্ক কম। চর্বি কঠিন হলেও কেলাসিত হয় না। চর্বি বা তেল সাধারণত বিশুদ্ধ অবস্থায় বর্ণহীন ও গন্ধহীন হয়। সমযোজী যৌগ বলে চর্বি ও তেল জলে অদ্রাব্য। এদের ঘনত্ব জলের চেয়ে কম, তাই জলের উপরে ভাসে। এগুলি জৈব দ্রাবকে [যেমন—ইথার, ক্লোরোফর্ম, কার্বন টেট্রাক্লোরাইড, বেঞ্জিন] ইত্যাদি দ্রাব্য এবং তাপ বা তড়িতের কুপরিবাহী।

7.5.3 রাসায়নিক ধর্ম

(1) আর্দ্রবিশ্লেষণ ঃ

মানুষের দেহে খাদ্য পরিপাকক্রিয়ার সময় গ্লিসারাইডসমূহ এনজাইম [যেমন, লাইপেজ] এর উপস্থিতিতে আর্দ্রবিশ্লেষিত হয়ে গ্লিসারল ও ফ্যাটি অ্যাসিড উৎপন্ন করে।

আবার লঘু সালফিউরিক অ্যাসিডের উপস্থিতিতে উত্তপ্ত করলে চর্বি ও তেল আর্দ্রবিশ্লেষিত হয়।

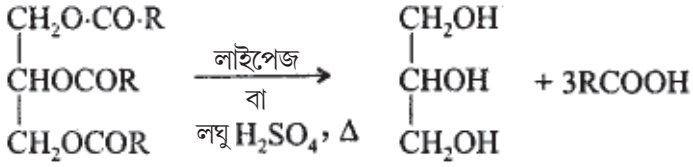

(2) সাবানীভবন বিক্রিয়া ঃ

ক্ষারের উপস্থিতিতে চর্বি ও তেল আর্দ্রবিশ্লেষিত হয়ে গ্লিসারল ও সাবান উৎপন্ন করে।

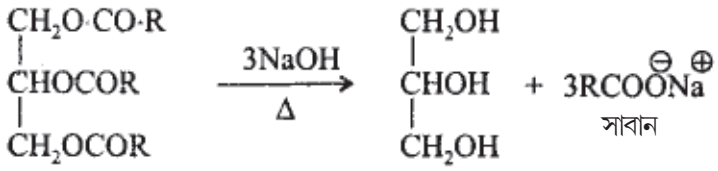

(3) হাইড্রোজিনোলিসিস (hydrogenolysis) ঃ

উচ্চ চাপে ও উচ্চ তাপাঙ্কে গ্লিসারাইডসমূহ CuO, Cr_2O_3 [কপার ক্রোমাইট] অনুঘটকের উপস্থিতিতে হাইড্রোজেনের সঙ্গে বিক্রিয়া করে বিজারিত হয় এবং হাইড্রোজিনোলিসিস প্রক্রিয়ায় (H_2 এর উপস্থিতিতে বিযোজন) গ্লিসারল ও অ্যালকোহল উৎপন্ন করে।

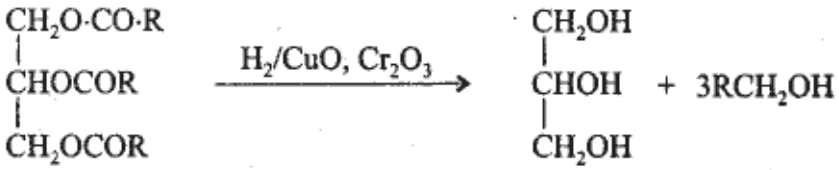

(4) হ্যালোজেনের সঙ্গে সংযোজন বিক্রিয়া ঃ

গ্লিসারাইড যদি অসম্পৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিড এবং গ্লিসারলের বিক্রিয়ায় উৎপন্ন হয় তবে ঐ গ্লিসারাইড হ্যালোজেনের সঙ্গে বিক্রিয়া করে যুত যৌগ গঠন করে। কয়টি হ্যালোজেন পরমাণু যুক্ত হবে তা নির্ভর করে দ্বিন্ধনের সংখ্যার উপর। অর্থাৎ একটি দ্বিবন্ধন থাকলে দুটি হ্যালোজেন পরমাণু (ডাই-হ্যালাইড); দুটি দ্বিবন্ধন থাকলে চারটি হ্যালোজেন পরমাণু (টেট্রাহ্যালাইড) ইত্যাদি যৌগ গঠন করবে।

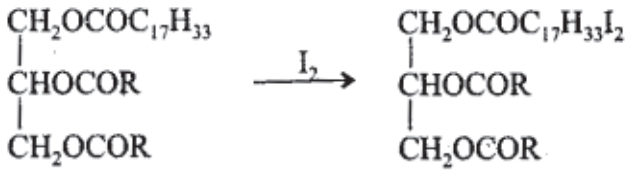

উপরের গ্লিসারাইডে ওলেইক অ্যাসিড বর্তমান।

(5) পলিমেরাইজেশন বিক্রিয়া ঃ

প্রাণিজ বা উদ্ভিজ্জ তেল বেশিদিন বায়ুর সংস্পর্শে রাখলে গ্লিসারাইডের সঙ্গে বায়ুর অক্সিজেনের বিক্রিয়া ঘটে। এই বিক্রিয়ায় প্রথমে হাইড্রোপারক্সাইড, পার-অক্সাইড ও সবশেষে নতুন কার্বন-কার্বন বন্ধন রচিত হয়ে পলিমার যৌগ উৎপন্ন হয়। তেলে অসম্পৃক্ত অ্যাসিড থাকলে [যেমন লিনোলেইক অ্যাসিড] তবেই এই বিক্রিয়া লক্ষ্য করা যায়। এই নীতির উপর ভিত্তি করেই 'শুষ্ককারী তেল' (drying oil) প্রস্তুত করা হয়। এই শুষ্ক তেল শিল্পে পেন্ট ও বার্ণিশের কাজে লাগে।

নীচের বিক্রিয়ায় এক অণু লিনোলেইক অ্যাসিড আছে এমন গ্লিসারাইড নেওয়া হয়েছে।

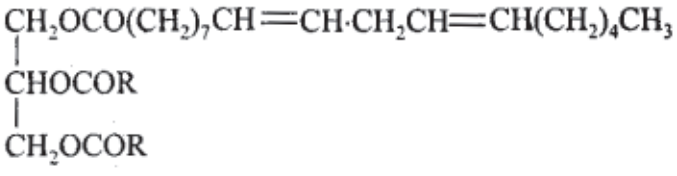

যদি

ধরা যায় তবে গ্লিসারাইডটি হবে

$$G—CH=CHCH_2CH=CH—M$$

উপরের যৌগটির সঙ্গে বিক্রিয়া নিম্নরূপ

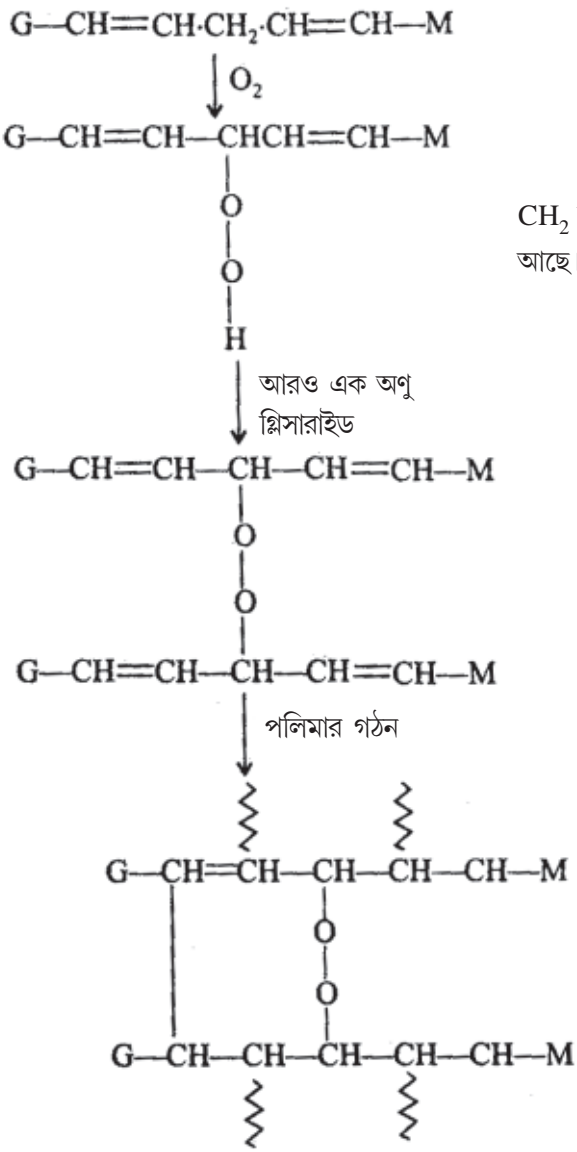

CH_2 মূলকে দুটি allylic হাইড্রোজেন আছে। তাই তারা সক্রিয়

পলিমার (drying oil)

(6) চর্বি ও তেল দীর্ঘদিন জলীয় বাষ্প ও বায়ুর সংস্পর্শে থাকলে গ্লিসারাইডের আর্দ্রবিশ্লেষণ ও জারণের ফলে ঐ চর্বি বা তেল দুর্গন্ধযুক্ত (rancid) হয় এবং খাবার উপযুক্ত থাকে না।

7.6 চর্বি ও তেলে বিভিন্ন সম্পৃক্ত ও অসম্পৃক্ত অ্যাসিডের শতকরা হার

কয়েকটি পরিচিত চর্বি ও তেলে সম্পৃক্ত ও অসম্পৃক্ত অ্যাসিডের শতকরা উপস্থিতির হার সারণী-4 এ দেখান হল ঃ

সারণী—4

চর্বি/ তেলের নাম	অ্যাসিডের নাম ও শতকরা হার						
	লরিক	মিরিস্টিক	পামিটিক	স্টিয়ারিক	ওলেইক	লিনোলেইক	লিনোলেনিক
নারকেল তেল	8-10		10-15	2-5	15-40	20-30	
তিসির তেল			—	—	19	24	47
সয়াবিন তেল			12	—	24	50	
তুলাবীচি তেল			23	—	22	48	
সরষের তেল			3-4	3-5	10-46	10-30	
অলিভ তেল					80	8-10	
সূর্যমুখী তেল			2-8	—	20-40	50-70	
মানুষের চর্বি			20-25	—	≈ 40	≈ 8	
গরুর চর্বি			20-30	15-25	30-40	—	

7.7 চর্বি ও তেলের রাসায়নিক বিশ্লেষণ

প্রকৃতি থেকে প্রাপ্ত চর্বি ও তেলের রাসায়নিক বিশ্লেষণ প্রয়োজন। গ্লিসারাইডে ফ্যাটি অ্যাসিডের কার্বন শৃঙ্খলের দৈর্ঘ্য, অসম্পৃক্ততার মাত্রা, চর্বি ও তেলে মুক্ত ফ্যাটি অ্যাসিডের পরিমাণ ও জলে দ্রবীভূত ও স্টীম উদ্বায়ী ফ্যাটি অ্যাসিডের পরিমাণ কত—এসব তথ্য জানতে পারলে চর্বি ও তেলের প্রকৃতি ও ব্যবহারের ক্ষেত্র সম্বন্ধে ধারণা করা যায়। এখানে কয়েকটি পদ্ধতি সংক্ষেপে উল্লেখ করা হল।

(1) সাবানীভবন মান (saponification value) ঃ

1 গ্রা চর্বি বা তেল সম্পূর্ণরূপে আর্দ্রবিশ্লেষণ করার পর উৎপন্ন ফ্যাটি অ্যাসিড সাবানীভবন প্রক্রিয়ায় প্রশমিত করতে কত মিগ্রা KOH এর প্রয়োজন সেই সংখ্যাকে সাবানীভবন মান বলে।

ধরি, গ্লিসারাইডের আপেক্ষিক গুরুত্ব = M

সাবানীভবনের জন্য KOH এর পরিমাণ = x মিগ্রা

$\therefore$ সাবানীভবন মান $= \frac{x}{M}$

এই পদ্ধতির সাহায্যে চর্বি/তেলে উপস্থিত গ্লিসারাইডের গড় আ. গু. এবং ফ্যাটি অ্যাসিডের দৈর্ঘ্য সম্বন্ধে ধারণা করা যায়।

(2) আয়োডিন মান (iodine value) ঃ

কত গ্রাম আয়োডিন 100 গ্রা চর্বি/তেলের সঙ্গে যুক্ত হতে পারে আয়োডিনের সেই সংখ্যাকে আয়োডিন মান বলে।

ধরা যাক,

চর্বি বা তেলের ওজন = x গ্রা

বিক্রিয়ক আয়োডিনের ওজন = y গ্রা

$\therefore$ আয়ডিনের মান (বা সংখ্যা)

(3) অ্যাসিড মান (acid value) ঃ

কোন চর্বি বা তেলের অ্যাসিড মান গ্লিসারাইডে মুক্ত অ্যাসিডের পরিমাণ নির্দেশ করে।

1 গ্রা ফ্যাটে উপস্থিত মুক্ত অ্যাসিডকে প্রশমিত করতে কত মিগ্রা KOH এর প্রয়োজন, সেই সংখ্যাকে অ্যাসিড মান বলে।

(4) রিচার্ট-মিশ্‌ল মান (Reichert-Meissl value) ঃ

চর্বি বা তেলে, জলে দ্রবীভূত এবং স্টীম উদ্বায়ী মুক্ত অ্যাসিডের পরিমাণ এই পদ্ধতিতে নির্ণয় করা যায়।

5 গ্রা চর্বি/তেল প্রশমিত করতে কত মিলি 0.1 *M* KOH এর প্রয়োজন, ক্ষারের সেই সংখ্যাকে রিচার্ট-মিশ্‌ল মান বলে।

7.8 উদ্ভিজ্জ তেল থেকে বনস্পতি তৈরির শিল্প-পদ্ধতি

বনস্পতি প্রস্তুতির জন্য (১) উদ্ভিজ্জ তেল, (২) হাইড্রোজেন গ্যাস ও (৩) নিকেল অনুঘটক প্রয়োজন।

নিকেল অনুঘটকের উপস্থিতিতে উদ্ভিজ্জ তেল হাইড্রোজেন গ্যাস দ্বারা বিজারিত করে বনস্পতি প্রস্তুত করা হয়।

(1) উদ্ভিজ্জ তেল ঃ

নারকেল তেল, সয়াবিন তেল, সূর্যমুখী তেল, তুলাবীচি তেল প্রভৃতি তেলের গ্লিসারাইডে অসম্পৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিড বর্তমান। এ ধরণের তেল বনস্পতি তৈরির কাঁচামাল হিসাবে ব্যবহৃত হয়।

(2) হাইড্রোজেন ঃ

(a) স্টীম আয়রণ পদ্ধতি ঃ উত্তপ্ত লৌহের উপর দিয়ে স্টীম চালনা করলে হাইড্রোজেন গ্যাস উৎপন্ন হয়, $3Fe + 4H_2O \rightleftharpoons Fe_3O_4 + 4H_2$

(b) জলের তড়িৎবিশ্লেষণ ঃ নিকেল তড়িদ্বার ব্যবহার করে ক্ষারীয় জলকে তড়িতের সাহায্যে বিযোজিত করলে ক্যাথোডে H_2 এবং অ্যানোডে O_2 গ্যাস উৎপন্ন হয়। এই পদ্ধতিতে বিশুদ্ধ H_2 পাওয়া যায় ঠিকই কিন্তু খরচ সাপেক্ষ বলে আমাদের দেশের পক্ষে সুবিধাজনক নয়।

(c) প্রাকৃতিক গ্যাস ঃ প্রাকৃতিক গ্যাসে মিথেন থাকে। অধিক তাপমাত্রায় প্রাকৃতিক গ্যাসকে বিযোজিত করে বিশুদ্ধ H_2 গ্যাস পাওয়া যায়।

$$CH_4 \xrightarrow{1200^\circ} C + 2H_2$$

(3) অনুঘটক ঃ

বনস্পতি তৈরি করতে অনুঘটক হিসাবে নিকেল (Ni) ব্যবহার করা হয়। নিকেল ফরমেট (Nickel formate) উত্তপ্ত করে Ni পাওয়া যায়।

$$(HCOO)_2Ni,\ 2H_2O \rightarrow Ni + 2CO_2 + H_2 + 2H_2O$$

উদ্ভিজ্জ তেলের সঙ্গে পরিমাণমত নিকেল ফরমেট মিশ্রিত করে নির্দিষ্ট চাপ ও তাপমাত্রায় বিশুদ্ধ H_2 গ্যাস চালনা করে অসম্পৃক্ত অ্যাসিডের গ্লিসারাইডকে আংশিক বিজারিত করে বনস্পতি তৈরি করা হয়। এভাবে প্রস্তুত বনস্পতিতে ভিটামিন-এ এবং ভিটামিন-ডি মেশান হয়। কারণ চর্বি বা তেলে এই ভিটামিন দুটি অনুপস্থিত থাকে। সামুদ্রিক কড মাছের যকৃৎ-এর তেলে 'ভিটামিন-ডি'-এর উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। মানুষের সুস্বাস্থ্যের জন্য এই ভিটামিনের প্রয়োজন আছে।

7.9 চর্বি ও তেল সম্বন্ধে বিশেষ সংযোজন

(1) প্রাকৃতিক চর্বি ও তেলের গ্লিসারাইডে জোড় সংখ্যক কার্বন পরমাণুযুক্ত ফ্যাটি অ্যাসিড থাকে।

(2) এই গ্লিসারাইডগুলি সাধারণত মিশ্র গ্লিসারাইড হয়।

(3) অসম্পৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিডসমূহ দ্বিবন্ধ সাপেক্ষে সিস্ (cis) কন্‌ফিগারেশনে থাকে।

(4) হাইড্রোজেনেটেড (hydrogenated) বনস্পতি খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করা স্বাস্থ্যের পক্ষে ক্ষতিকর। সম্পৃক্ত চর্বি/তেল সহজ পাচ্য নয়। এরা রক্তে কোলেস্টেরল ও ট্রাই-গ্লিসারাইডের মাত্রা বৃদ্ধি করে। ফলে ধমনীর (artery) ভিতর দিয়ে রক্ত চলাচলে বিঘ্ন ঘটার সম্ভভাবনা বাড়িয়ে দেয় এবং হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ার প্রবণতা বৃদ্ধি পায়।

(5) চর্বি ও তেলের গ্লিসারাইডে জৈব অ্যাসিডের অসম্পৃক্ততা (দ্বিবন্ধের সংখ্যা) বেশি থাকলে ঐ তেল দিয়ে রান্না করার সময় বেশি তাপমাত্রায় অসম্পৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিডগুলি বায়ুর অক্সিজেনের সঙ্গে বিক্রিয়া করে পারঅক্সাইড উৎপন্ন করে। এই পারঅক্সাইডগুলি উচ্চ তাপমাত্রায় বিযোজিত হয়ে অস্থায়ী মুক্তি মূলক (free radical) গঠন করে। খাদ্যে এদের উপস্থিতি শরীরের পক্ষে বিপজ্জনক।

(6) সরষের তেলে ঝাঁঝ থাকার কারণ ঐ তেলে অ্যালাইল আইসোথায়োসায়ানেট (allyl isothiocyanate) এর উপস্থিতি। সরষেতে সিনিগ্রিন (sinigrin) নামক গ্লুকোসাইডে এটি গ্লুকোজের সঙ্গে যুক্ত অবস্থায় থাকে। সরষের দানায় থাকে মাইরোসিন (myrosin) নামক

এনজাইম (enzyme)। এই এনজাইম গ্লুকোসাইডকে আর্দ্রবিশ্লেষিত করে গ্লুকোজ, অ্যালাইল আইসোথায়োসায়ানেট এবং পটাশিয়াম বাইসালফেট উৎপন্ন করে। এটি তেলের সঙ্গে মিশে থাকার জন্য তেল ঝাঁঝাল হয়। বিক্রিয়া—

$$C_{10}H_{16}O_9NS_2K + H_2O = C_6H_{12}O_6 + CH_2 = CHCH_2NCS + KHSO_4$$

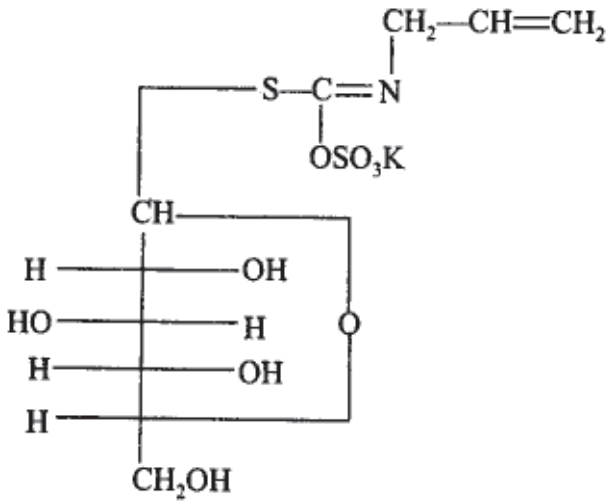

সিনিগ্রিন

sinigrin

$CH_2 = CH.CH_2.NCS$

অ্যালাইল আইসোথায়োসায়ানেট

(7) সামুদ্রিক প্রাণী ও মাছ থেকে যে তেল সংগ্রহ করা হয় তা মানুষের রোগ উপশমের জন্য কখনও কখনও প্রয়োজন হয়। যেমন, তিমি (Whale) মাছের তেল, হাঙ্গরের যকৃতের তেল (shark liver oil) এবং কড মাছের যকৃতের তেল (cod liver oil). এই তেলগুলিতে সাধারণত ভিটামিন-ডি থাকে যা সুস্থ হাড়ের জন্য প্রয়োজনীয়।

(8) সরষের তেলে শেয়ালকাঁটা তেলের উপস্থিতির নিরীক্ষা ঃ

(Test for presence of argemone oil in mustard oil)

পরীক্ষা-I (অধ্যাপক সরোজ কুমার চক্রবর্তী) ঃ

একটি পরখ-নলে 5 মিলি সন্দেহজনক তেল নিয়ে তার সঙ্গে 2 মিলি গাঢ় হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড মিশিয়ে ভাল করে নেড়ে নিন। গরম জলে ডুবিয়ে মিনিট দুয়েক গরম করুন। ঠান্ডা করে নিন। এবার পরখ-নলটিকে তেরছা করে ধরে 0.2 মিলি ব্রোমেট-ব্রোমাইড মিশ্রণ (1.6 গ্রা পটাশিয়াম ব্রোমেট + 25 গ্রা পটাশিয়াম ব্রোমাইড + 90 মিলি পাতিত জল) যোগ করুন। উপরের তেলের স্তরকে কোনও রকমেই ব্যাহত না করে দুই হাতের চেটোর মধ্যে রেখে পরখ-নলটি ঘোরাতে থাকুন।

বিশুদ্ধ সর্ষের তেলের ক্ষেত্রে অ্যাসিড স্তর হাল্কা হলুদ রঙ (উদ্ভূত ব্রোমিন-এর জন্যে) ধারণ করবে। 0.25% শেয়ালকাঁটার তেল থাকলে রঙ হবে হাল্কা কমলা। এর পরিমাণ বৃদ্ধির সঙ্গে রঙের গাঢ়ত্ব বেড়ে কমলা হয়ে লাল হবে; 0.5% এর বেশি হলে কমলা অধঃক্ষেপ পড়বে (সম্ভভবতঃ স্যাংগুইনারিন্ এবং / বা ডাইহাইড্রোস্যাংগুইনারিন্-এর পারব্রোমাইড উৎপন্ন হওয়ার ফলে)।

পরীক্ষা-II প্রতিপ্রভা (fluorescence) নিরীক্ষা (এস্. এন্. সরকার; ডি. এন্. নন্দী) ঃ

1 মিলি গাঢ় হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড ও 0.5 মিলি ইথাইল অ্যালকোহলের মিশ্রণে 2 মিলি তেলের নমুনা যোগ করুন। এক মিনিট ধরে ঝাঁকান; ফুটন্ত জলে ডুবিয়ে 10 মিনিট গরম করুন আর মাঝে মাঝে নাড়তে থাকুন। অতিবেগুনী আলোয় ধরলে নীচের অ্যাসিড স্তর থেকে গোলাপী প্রতিপ্রভা বের হলে বুঝবেন যে তেলের নমুনায় শেয়ালকাঁটা তেলের ভেজাল রয়েছে (সুবেদিতা 0.25%)।

পরীক্ষা-III ফেরিক ক্লোরাইড নিরীক্ষা ঃ

একটা পরিষ্কার পরখ-নলে 10 মিলি তেলের নমুনা নিন। 3 মিলি গাঢ় হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড মেশান। গরম জলে 1 মিনিট গরম করুন, ভাল করে ঝাঁকান। আবার 2-3 মিনিট ধরে গরম জলে গরম করুন, যতক্ষণ না অ্যাসিড ও তেলের স্তর আলাদা হয়। যতটা সম্ভভব তেলের স্তর একটা ড্রপার দিয়ে বের করে নিন। পরখ-নলে যে অ্যাসিড দ্রবণ রইল, তাতে 1 মিলি ফেরিক ক্লোরাইড দ্রবণ 20 গ্রা ফেরিক ক্লোরাইড ($FeCl_3.6H_2O$) + 80 মিলি পাতিত জল + 10 মিলি গাঢ় হাইড্রোক্লোরিক অ্যাসিড ধীরে ধীরে পরখ-নলের গা বেয়ে ঢালুন। দু হাতের চেটোয় রেখে পরখ-নলটি ধীরে ধীরে ঘোরান, দেখবেন যাতে অবশিষ্ট তেলে ও জলে মিশে না যায়। আবার গরম জল 10 মিনিট ধরে গরম করুন। শেয়ালকাঁটার তেল থাকলে দুটি স্তরের মিলনস্থলে বা অ্যাসিড স্তরে কমলা-লাল অধঃক্ষেপ পড়বে।

7.10 সারাংশ

এই এককটি পাঠ করার পর আপনি যা শিখতে পেরেছেন তার সারমর্ম হল ঃ

- উদ্ভিজ্জ ও প্রাণিজ উৎস থেকে চর্বি ও তেল সংগ্রহ করা হয়। সাধারণ তাপমাত্রায় কঠিন অবস্থায় থাকলে তাদের বলে চর্বি আর তরল অবস্থায় থাকলে তাদের বলে তেল
- চর্বি ও তেল ফ্যাটি অ্যাসিড ও গ্লিসারলের বিক্রিয়ায় উৎপন্ন এস্টার শ্রেণীর যৌগ। এদের ট্রাইগ্লিসারাইড বলে। অসম্পৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিডের ট্রাইগ্লিসারাইড তরল আর সম্পৃক্ত ফ্যাটি অ্যাসিডের ট্রাইগ্লিসারাইড কঠিন
- আমাদের খাদ্য তালিকায় চর্বি ও তেল শক্তি-উৎপাদক প্রধান খাদ্য (শ্বেতসার ও শর্করার সঙ্গে) হিসাবে পরিগণিত
- খাদ্যের উপযোগী এবং খাদ্যের অনুপযোগী চর্বি ও তেল সম্ভবন্ধে ধারণা
- ক্ষারের উপস্থিতিতে গ্লিসারাইডসমূহ আর্দ্রবিশ্লেষিত হয়ে সাবান ও গ্লিসারল উৎপন্ন করে। সে জন্য সাবান শিল্পে এবং গ্লিসারল প্রস্তুতিতে চর্বি ও তেলের খুব চাহিদা
- প্রাকৃতিক উৎস থেকে বিশুদ্ধ তেল কীভাবে সংগ্রহ করা হয়
- চর্বি ও তেলে উপস্থিত গ্লিসারাইডসমূহের নামকরণ, ভৌত ও রাসায়নিক ধর্ম
- কোন্ কোন্ চর্বি ও তেলে কোন্ কোন্ ফ্যাটি অ্যাসিড আছে এবং তাদের নামের তালিকা
- সাবানীভবন মান, আয়োডিন মান, অ্যাসিড মান প্রভৃতির সংজ্ঞা এবং এই মানগুলি থেকে ট্রাইগ্লিসারাইড সম্ভবন্ধে ধারণা
- বনস্পতি (মার্জারিন) কিভাবে প্রস্তুত করা হয়
- সম্পৃক্ত বা অসম্পৃক্ত চর্বি/তেল খাদ্য হিসাবে গ্রহণ করলে আমরা কী ধরণের অসুবিধার সম্মুখীন হয়ে থাকি
- সরষের তেলে ঝাঁঝের কারণ কী
- সরষের তেল বিশুদ্ধ কিনা তার পরীক্ষা

7.11 সর্বশেষ প্রশ্নাবলি

[A] সংক্ষিপ্ত উত্তর লিখুন ঃ

(1) চর্বি ও তেলে কোন্ শ্রেণীর জৈব যৌগ বর্তমান? বিক্রিয়কগুলি কী কী?

(2) উদ্ভিজ্জ তেল ও খনিজ তেলের মধ্যে পার্থক্য কী?

(3) আমাদের দৈনন্দিন খাদ্য তালিকায় প্রধান খাদ্য হিসাবে চর্বি ও তেলের প্রয়োজনীয়তা উল্লেখ করুন।

(4) দুটি খাবার উপযুক্ত ও দুটি খাবার অনুপযুক্ত উদ্ভিজ্জ তেলের নাম লিখুন।

(5) ডালডা বনস্পতি খাদ্য হিসাবে ক্ষতিকারক কেন?

[B] শূন্যস্থান পূরণ করুন [বন্ধনীতে দেওয়া উত্তরগুলির মধ্যে সঠিক উত্তরটি বেছে নিন] ঃ

(1) প্রাকৃতিক চর্বি বা তেলে সাধারণতঃ —— গ্লিসারাইডের আধিক্য দেখা যায়।

(সরল, মিশ্র)

(2) পামিটিক অ্যাসিড একটি —— অ্যাসিড, কিন্তু ওলেইক অ্যাসিড একটি —— অ্যাসিড।

(অসম্পৃক্ত, সম্পৃক্ত)

(3) প্রাকৃতিক তেলের গ্লিসারাইডে —— সংখ্যক কার্বন পরমাণুযুক্ত ফ্যাটি অ্যাসিড ও গ্লিসারলের রাসায়নিক যৌগ। (জোড়, বিজোড়)

(4) সূর্যমুখী তেলে —— অ্যাসিডের পরিমাণ সবচেয়ে বেশি থাকে।

(লরিক, পামিটিক, ওলেইক ও লিনোলেইক)

[C] রচনাভিত্তিক প্রশ্ন ঃ

(1) সরষের দানা থেকে সরষের তেল কীভাবে সংগ্রহ করা হয়?

(2) অশোধিত তেল থেকে মুক্ত অ্যাসিড কীভাবে দূর করা যায়?

(3) গ্লিসারাইড কাদের বলা হয়? সরল ও মিশ্র গ্লিসারাইডের একটি করে উদাহরণ দিন।

(4) আর্দ্রবিশ্লেষণ ও সাবানীভবন বিক্রিয়া দুটির মধ্যে পার্থক্য কী?

(5) প্রাকৃতিক উৎস থেকে প্রাপ্ত চর্বি বা তেল বেশিদিন বায়ুর সংস্পর্শে রেখে দিলে কী ঘটে?

(6) সাবানীভবন মান, আয়োডিন মান বলতে কী বোঝেন? এদের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করুন।

(7) বনস্পতি তৈরি করার জন্য নিকেল অনুঘটক এবং হাইড্রোজেনের প্রয়োজন হয়। এগুলি কীভাবে সংগ্রহ করবেন?

(8) সরষের তেলের ঝাঁঝ লাগার কারণ ব্যাখ্যা করুন।

(9) সরষের তেল বিশুদ্ধ কিনা কী করে তা পরীক্ষা করবেন?

7.12 উত্তরমালা

[A] (1) 7.1 দেখুন।

(2) 7.1.1 দেখুন।

(3) 7.2 দেখুন।

(4) 7.2.1 দেখুন।

(5) 7.9 এর (4) দেখুন।

[B] (1) মিশ্র

(2) (ক) সম্পৃক্ত (খ) অসম্পৃক্ত

(3) জোড়

(4) লিনোলেইক

[C] (1) 7.3 দেখুন।

(2) 7.3.1 দেখুন।

(3) দীর্ঘ শৃঙ্খলযুক্ত ফ্যাটি অ্যাসিড ও গ্লিসারলের রাসায়নিক বিক্রিয়ায় জলসহ যে জৈব যৌগ (এস্টার) উৎপন্ন হয় তাদের গ্লিসারাইড বলে।

উদাহরণের জন্য 7.5 দেখুন।

(4) অ্যাসিডের উপস্থিতিতে গ্লিসারাইড ও জলের বিক্রিয়াকে আর্দ্রবিশ্লেষণ বলে। কিন্তু ক্ষারের উপস্থিতিতে গ্লিসারাইডের আর্দ্রবিশ্লেষণ করলে সাবান উৎপন্ন হয় বলে এই বিক্রিয়াকে সাবানীভবন বিক্রিয়া বলে।

(5) 7.9 এর (6) দেখুন।

(6) 7.9 এর (8) দেখুন।

References :

(1) Organic Chemistry :—I. L. Finar Vol.-I & II;

(2) Advanced Organic Chemistry :—B. S. Bahl & A. Bahl.

(3) Organic Chemistry (Vol. I) :—S. M. Mukherjee, S. P. Singh & R. P. Kapoor.

একক 8 □ রঙশিল্প ও বার্ণিশ (Paints and Varnishes)

গঠন

8.0 প্রস্তাবনা

উদ্দেশ্য

8.1 রঙের প্রয়োজনীয় উপাদান

8.2 রঞ্জক পদার্থের বৈশিষ্ট্য

8.3 রঙের কতকগুলি ধর্ম

8.4 রঙের উপাদান ও ভূমিকা

8.5 রঙ উৎপাদন পদ্ধতি

8.6 ইমালশান রঙ

8.6.1 ইমালশান রঙের দোষ-গুণ

8.7 তরুক্ষীর রঙ

8.8 পিগমেন্ট

8.9 বার্ণিশ

8.10 ল্যাকার ও এনামেল

8.11 রঙ লাগাবার পদ্ধতিসমূহ

8.12 পেন্ট ও বার্ণিশের মধ্যে পার্থক্য

8.13 ভারতের কয়েকটি প্রধান রঙ উৎপাদক সংস্থার নাম

8.14 সারাংশ

8.15 সর্বশেষ প্রশ্নাবলি

8.16 উত্তরমালা

8.0 প্রস্তাবনা

বর্তমান সভ্যতায় রঙের গুরুত্ব অপরিসীম। প্রাচীন ঐতিহাসিক বাড়ী, মন্দির, মসজিদ সংরক্ষণে রঙের ভূমিকা অনস্বীকার্য। রঙ ব্যবহারের উপযোগিতা দুটি—(i) সংরক্ষণ (ii) সৌন্দর্য বৃদ্ধি।

রঙ (paint) হল, সংরক্ষণ ও সৌন্দর্য বৃদ্ধির তাগিদে ব্যবহৃত—একটি অস্বচ্ছ কঠিনের অর্থাৎ রঞ্জক পদার্থের তরল মাধ্যমে প্রলম্বিত মিশ্রণ। মিশ্রণের তেল বা রেজিন, বস্তুর উপরিতলে একটি আবরণী আস্তরণ সৃষ্টি করে, রঞ্জক পদার্থ সেই আস্তরণকে রঙীন করে এবং রেজিন কর্তৃক ধৃত থাকে। উদ্বায়ী দ্রাবক বুরুশ দ্বারা মাখানোর উপযুক্ত সান্দ্রতা রঙকে প্রদান করে। তরল মাধ্যমটি অর্থাৎ তেল দ্রুত জারণ, বহুযোজন এবং বাষ্পায়ন প্রক্রিয়ার সাহায্যে বস্তুর উপরিতলে একটি পাতলা আস্তরণ তৈরি করে। কখনও কখনও রঙে আস্তরণ গঠনের উদ্দেশ্যে রেজিন (resin)-ও ব্যবহৃত হয়। তরল অংশটিকে মাধ্যম (vehicle) বলে। রেজিন সাধারণ অর্থে বাইণ্ডার। মাধ্যমের একটি অংশ তেল (drying oil) অপর অংশ উদ্বায়ী দ্রাবক (volatile solvent) উপরিতলের আস্তরণ, বস্তুকে জলবায়ুর প্রকোপ থেকে রক্ষা করে এবং রঞ্জক পদার্থ সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে।

উদ্দেশ্য :

এই এককটি লেখার উদ্দেশ্য হল রঙশিল্প ও বার্ণিশ সম্ভবন্ধে আপনার সম্যক পরিচয় ঘটান। এককটি পাঠের পর আপনি যা জানতে পারবেন সেগুলি হল—

- রঙ বলতে কি বোঝায়
- রঞ্জক পদার্থের বৈশিষ্ট্য এবং রঙের উল্লেখযোগ্য ধর্ম কি
- রঙের প্রয়োজনীয় উপাদান ও ভূমিকা কি
- কিভাবে রঙ উৎপাদন করা হয়
- ইমালশান রঙ ও তরুক্ষীর রঙের পার্থক্য এবং এদের দোষ-গুণ
- পিগমেন্ট ও বার্ণিশ বলতে কি বোঝায় এবং এদের কিছু উদাহরণ
- তেল বার্ণিশ ও স্পিরিট বার্ণিশের মধ্যে পার্থক্য
- ভারতের কয়েকটি রঙ উৎপাদন সংস্থার নাম

8.1 রঙের প্রয়োজনীয় উপাদান

রঙের মূল উপাদান হল রঞ্জক পদার্থ (pigment)। এই রঞ্জক পদার্থ সাধারণত অজৈব যৌগ। তবে জৈব যৌগও ব্যবহৃত হয়। অদ্রাব্য জৈব রঞ্জক পদার্থকে টোনার বলে। অ্যালুমিনিয়াম হাইড্রক্সাইড, বেরিয়াম সালফেট বা মাটির ওপর অধঃক্ষিপ্ত জৈব রঞ্জক পদার্থকে লেক (lake) বলে। রঙের দাম কমাতে এবং রঙকে টেঁকসই করতে অনেক সময় নিষ্ক্রিয় ফিলার (filler) বা বিস্তারক (extender) পদার্থ ব্যবহৃত হয়।

8.2 রঞ্জক পদার্থের বৈশিষ্ট্য

(i) রঙের কঠিন কণাগুলির ধ্বংসাত্মক আলোকরশ্মিকে প্রতিফলন করার ক্ষমতা থাকা বাঞ্ছনীয়। এতে রঙের স্থায়িত্ব বৃদ্ধি পায়।

(ii) রঞ্জক পদার্থ অস্বচ্ছ হওয়া বাঞ্ছনীয়।

(iii) রঞ্জক পদার্থ রাসায়নিকভাবে নিষ্ক্রিয় হওয়া উচিত। এর ফলেও রঙের স্থায়িত্ব বৃদ্ধি পায়।

(iv) রঞ্জক পদার্থ বিষাক্ত হওয়া উচিত নয়।

(v) রঞ্জক পদার্থগুলির আস্তরণ গঠনকারী উপাদানগুলির সহিত উত্তমরূপে মিশ্রিত হওয়ার ক্ষমতা থাকা বাঞ্ছনীয়।

(vi) রঞ্জক পদার্থের মূল্য সুলভ হওয়া উচিত।

8.3 রঙের কতকগুলি ধর্ম

(i) উপরিতল আবরণ ক্ষমতা

(ii) আকর্ষণীয় বর্ণ

(iii) জলবায়ুর আক্রমণ প্রতিহত করার ক্ষমতা

(iv) ধৌত সহন ক্ষমতা

(v) বাহ্যশোভা বর্দ্ধন ক্ষমতা

(vi) ধাতুর ক্ষয় প্রতিরোধী ক্ষমতা

8.4 রঙের উপাদান ও ভূমিকা

উপাদান	ভূমিকা
1. রঞ্জক পদার্থ	আস্তরণকে ধ্বংসাত্মক UV আলোর আক্রমণ থেকে রক্ষা করা, আস্তরণের শক্তিবৃদ্ধি, সৌন্দর্য বৃদ্ধি, এছাড়া রঞ্জক পদার্থের যে সমস্ত গুণ থাকা দরকার সেগুলি হল—অস্বচ্ছতা, আবরণ, ক্ষমতা, তেলের সঙ্গে মিশ্রণ ক্ষমতা, রাসায়নিক নিষ্ক্রিয়তা, স্বল্প বিষক্রিয়া এবং ন্যায্য দাম।
2. বিস্তারক বা ফিলার	রঞ্জক পদার্থের মূল্য হ্রাস তৎসহ আবরণ ক্ষমতা বৃদ্ধি, জলবায়ুর আক্রমণ প্রতিরোধ ইত্যাদি।
3. আস্তরণ সৃষ্টিকারী পদার্থ ঃ যেমন— লিনসিড তেল, সয়াবিন তেল, ল্যাটেক্স, ইমালশান, রেজিন ইত্যাদি।	একটি সংরক্ষক আস্তরণ গঠন; তেলের ক্ষেত্রে জারণ এবং বহুযোজন প্রক্রিয়ার সাহায্যে আস্তরণ গঠিত হয়। আস্তরণ গঠন ব্যতিরেকে রঞ্জক পদার্থ বস্তুর উপরিতলে আটকে থাকতে পারে না।
4. থিনার ঃ অ্যালিফেটিক হাইড্রোকার্বন, ন্যাপ্থা, অন্যান্য পেট্রোলিয়াম অংশ পাতনজাত পদার্থ, টারপেনটাইন, ডাইপেন্টিন, টলুইন ও জাইলিন।	রঞ্জক পদার্থের প্রলম্বন, আস্তরণ সৃষ্টিকারী পদার্থের দ্রবণ প্রস্তুত করার জন্য এবং ঘন রঙকে পাতলা করার জন্য।
5. ড্রায়ার ঃ কোবাল্ট (Co), ম্যাঙ্গানিজ (Mn), লেড (Pb), সাবান।	আস্তরণ গঠন ত্বরান্বিত করা।
6. অ্যান্টিস্কিনিং এজেন্ট ঃ পলি হাইড্রক্সি ফেনল।	রঙ করার পূর্বে বুরুশে আস্তরণ সৃষ্টি রোধ করা।
7. প্লাস্টিসাইজার ঃ ট্রাইফিনাইল ফসফেট, ডাইবিউটাইনলল থ্যালেট, ক্যাস্টর অয়েল।	আস্তরণে স্থিতিস্থাপকতা দান, (যাতে আস্তরণে ফাটল না ধরে)।
8. রেজিন ঃ ভিনাইল অ্যাসিটেট, বিউটাডাইন স্টাইরিন পলিমার	তেল মাধ্যম রঙে প্রয়োজনীয় নয়। জল মাধ্যম রঙে আস্তরণ সৃষ্টির জন্য প্রয়োজন।

8.5 রঙ উৎপাদন পদ্ধতি

রঙ উৎপাদনে সব একক প্রক্রিয়ার সাহায্য নেওয়া হয়। কোন বিক্রিয়া সংঘটিত হয় না। রঙের কারখানায় যন্ত্রসজ্জা চারটি তলায় বিন্যস্ত থাকে। এর কারণ হল—উপাদানগুলিকে স্থানান্তরের জন্য অভিকর্ষকে কাজে লাগানো। ফলে শক্তি খরচ তথা ব্যয় কম হয়। উপাদানগুলি অর্থাৎ (i) রঞ্জক পদার্থ, (ii) মাধ্যম তেল, (iii) থিনার, (iv) প্লাস্টিসাইজার চারতলায় জড়ো করা হয়। তিনতলায় একটি মিক্সারে উপাদানগুলিকে আলোড়কের সাহায্যে উত্তমরূপে মিশ্রিত করা হয় এবং বল মিলে চূর্ণ করা হয়। এরপর দোতলায় একটি মিক্সারে থিনার মিশ্রিত করা হয় এবং সঙ্গে প্রয়োজন হলে আমেজ কারক (tinting agent) যোগ করা হয়। ফিলিং বা ভরণ মেশিনে নিয়ে যাওয়ার আগে রঙকে উত্তমরূপে ছেঁকে নেওয়া হয়। এরপর কৌটায় ভরে মুখ বন্ধ করে লেবেল আটকে বাজারে ছাড়া হয়।

প্রবাহ তালিকা

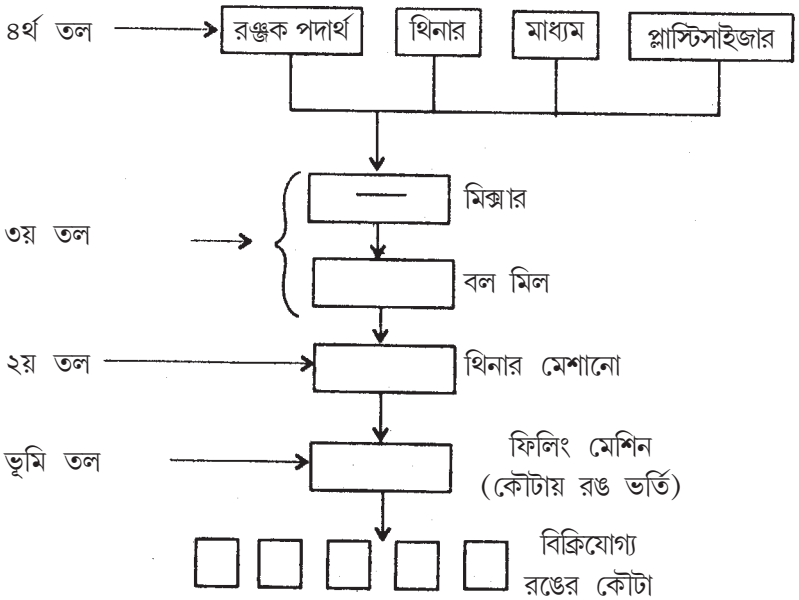

8.6 ইমালশান রঙ

ইমালশাল রঙ হল একটি ইমালশান। সাধারণতঃ ইমালশান তৈরি হয় দুটি উপকরণ দিয়ে। একটি উপকরণের প্রকৃতি জলীয় অপর উপকরণের প্রকৃতি তৈলাক্ত (oily). ইমালশান রঙের ক্ষেত্রে নিরবিচ্ছিন্ন মাধ্যম বা থিনার হল জল। এই রঙে জল থাকায় ইমালশান গঠনের একটি শর্ত পূরিত

হয়। ইমালশাল গঠনের অপর শর্ত পূরণ করে কৃত্রিম রেজিন। কৃত্রিম রেজিন এখানে আস্তরণ সৃষ্টিকারী উপাদান এবং বিস্তৃত মাধ্যম। রেজিনের সঙ্গে ড্রাইং অয়েল বা শুষ্কায়ন তেলও ব্যবহৃত হয়। এছাড়া ইমালশান রঙে বিস্তারক পদার্থ, রঞ্জক পদার্থ, ইমালশানকারক পদার্থ, স্থিতিকারক পদার্থ, ড্রায়ার, ফেননিবারক পদার্থ এবং সংরক্ষক পদার্থ ইত্যাদিও মিশ্রিত থাকে।

8.6.1 ইমালশান রঙের দোষ-গুণ

গুণ ঃ

(i) এই রঙের একটি উপাদান জল যা সস্তা এবং সহজলভ্য।

(ii) কোন বিষাক্ত বাষ্প বা তীব্র গন্ধ শুষ্কায়নে সৃষ্টি হয় না।

(iii) আগুন লাগার ভয় নেই।

(iv) সহজে বুরুশ দিয়ে লাগানো যায়।

(v) দ্রুত শুষ্কায়ন (দু' কোট একদিনে লাগানো যায়)।

(vi) আর্দ্র উপরিতলে প্রয়োগক্ষম।

(vii) সুলভ।

দোষ ঃ

(i) ইমালশানকারক পদার্থ ও স্থিতিকারক পদার্থ ব্যবহার অপরিহার্য্য।

(ii) উৎপাদন পদ্ধতি কিছুটা জটিল।

(iii) স্থায়িত্ব নিকৃষ্টতর।

(iv) উত্তাপ এবং তুষারে সংবেদনশীল।

(v) সচ্ছিদ্র আস্তরণ গঠন।

(vi) আবহাওয়াসহতা নিকৃষ্ট।

8.7 তরুক্ষীর রঙ (Latex Paint)

ঠিকভাবে বললে Latex emulsion paint বা emulsion polymerised paint বলতে হয়। অর্থাৎ তেল জলের ইমালশানে একটি কৃত্রিম পলিমার মূলতঃ thermoplastic পলিমার আস্তরণ সৃষ্টিকারী পদার্থ হিসাবে যখন ব্যবহৃত হয় তখন রঙের নাম হয় তরুক্ষীর রঙ।

তরুক্ষীর রঙের সুবিধা ঃ

(i) তরুক্ষীর রঙ প্রায় গন্ধহীন

(ii) চার ঘণ্টা পরেই আর এক কোট এই রঙ লাগানো যায়

(iii) এই রঙের আস্তরণ জল দিয়ে ধুয়ে পরিষ্কার করা এমনকি রগড়ে ধোয়াও সম্ভভব।

তরুক্ষীর রঙের অসুবিধা ঃ

শোষকতল যেমন প্লাস্টার, সিমেন্ট, ইটের গাঁথনি এগুলিতে তরুক্ষীর রঙের সংলগ্নতার কোন অসুবিধা নেই। কিন্তু মসৃণ তল হলে সংলগ্নতার অসুবিধা দেখা দেয় যেমন তল যদি তৈলাক্ত বা powdery হয়।

এই সংলগ্নতার অসুবিধা দূর করার জন্য এবং উন্নত জলরোধী ধর্ম আরোপ করার জন্য তরুক্ষীর রঙে অ্যালকিড রেজিন (alkyd resin) ইমালশান যোগ করা যেতে পারে। কিন্তু এই উন্নত ধর্ম পাওয়ার জন্য বেশী পরিমাণে alkyd resin ব্যবহার করতে হয় যার ফলে আবার অন্য অসুবিধা দেখা দেয় যেমন রঞ্জক পদার্থ বেশী ব্যবহার করতে হয় এবং রঙের ক্ষার সহন ক্ষমতা কমে যায়, ফলে নতুন প্লাস্টার-এ লাগানো সম্ভভব হয় না এবং বুরুশ দিয়ে লাগানোরও অসুবিধা হয় এবং রঙ গন্ধহীন থাকে না।

8.8 পিগমেন্ট (Pigment)

পিগমেন্ট বিভিন্ন রঙের হতে পারে। যেমন, সাদা—হোয়াইট লেড (PbO); জিঙ্ক হোয়াইট (ZnO), লিথোফোন, টাইটেনিয়াম ডাইঅক্সাইড (TiO_2)

লাল—রেড লেড (Pb_3O_4), ক্রোম রেড [আয়রণ অক্সাইড (Fe_2O_3)]

নীল—প্রুশিয়ান ব্লু, আল্ট্রামেরিন

হলুদ—ক্রোম ইয়েলো

সবুজ—ক্রোমিয়াম অক্সাইড (Cr_2O_3)

কালো—কার্বন ব্ল্যাক, গ্রাফাইট

8.9 বার্ণিশ (Varnish)

কোন শুষ্ককারী তেলে কোন প্রাকৃতিক বা কৃত্রিম রেজিনের কলয়ডীয় দ্রবণকে বার্ণিশ বলে। কোন উপযুক্ত তলে ইহাকে প্রয়োগ করলে ইহা বাষ্পীভবন, জারণ ও পলিমার গঠনের মাধ্যমে ঐ তলকে ক্ষয় থেকে রক্ষা করেও উহার সৌন্দর্য বৃদ্ধি করে।

বার্ণিশে চারটি উপাদান থাকে। যথা—রেজিন, শুষ্ককারী তেল, দ্রাবক বা থিনার ও ড্রায়ার।

রেজিন—কঠিন বা অর্দ্ধকঠিন অনিয়তাকার প্রাকৃতিক বা কৃত্রিম জৈব পদার্থ। যেমন, প্রাকৃতিক—শেল্যাক, রেজিন (পাইন গাছ থেকে প্রাপ্ত), কোপাল, ম্যানিলা ইত্যাদি।

কৃত্রিম—ইউরিয়া, ফরম্যালডিহাইড রেজিন, ফেনল-ফরম্যালডিহাইড রেজিন, পলিস্টাইরিন ইত্যাদি।

নীচে এই রেজিনগুলির রাসায়নিক গঠন উল্লেখ করা হল ঃ

(1) ইউরিয়া-ফরম্যালডিহাইড রেজিন ঃ

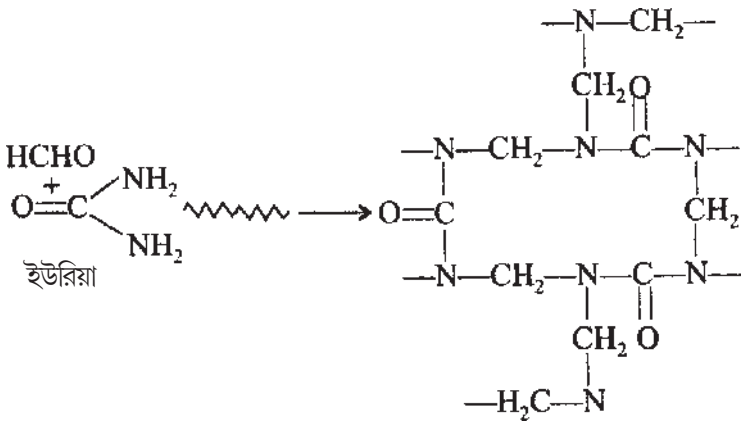

(2) ফেনল-ফরম্যালডিহাইড রেজিন ঃ

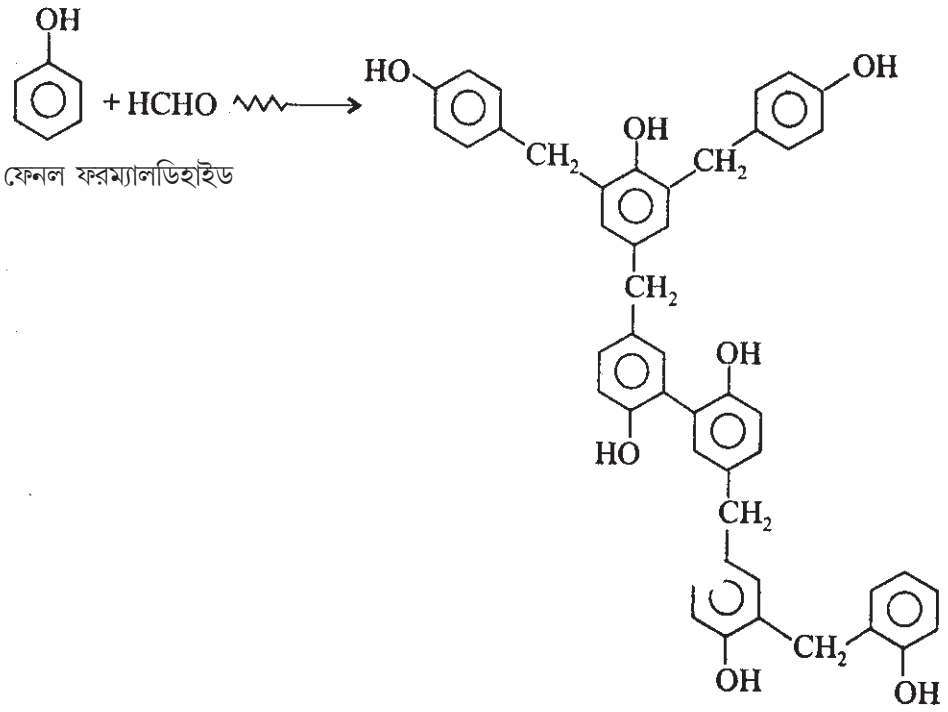

ফেনল ফরম্যালডিহাইড

(3) পলিস্টাইরিন রেজিন ঃ

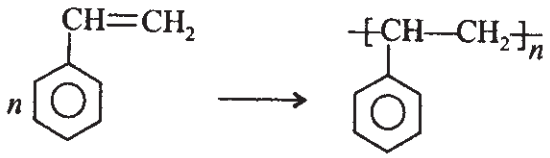

স্টাইরিন পলিস্টাইরিন

শুষ্ককারী তেল—যেমন তিসির তেল, সয়াবিন তেল, অনার্দ্র ক্যাস্টর তেল ইত্যাদি।

থিনার—যেমন, টারপেনটাইন, কেরোসিন, ইথাইল অ্যালকোহল, অ্যাসিটোন ইত্যাদি।

ড্রায়ার—ইহা শুষ্কীকরণের গতি বৃদ্ধি করে। যেমন, লেড, কোবাল্ট এবং ম্যাঙ্গানীজ লিনোলিয়েট বা ন্যাপথিনেট ইত্যাদি।

বার্ণিশ দুই প্রকার। যথা—তেল বার্ণিশ ও স্পিরিট বার্ণিশ।

তেল বার্ণিশ ঃ তেল বার্ণিশে একটি শুষ্ককারী তেল ও উদ্বায়ী দ্রাবক (যেমন টারপেনটাইন) ব্যবহার করা হয়। এই বার্ণিশ শুষ্ক হতে অনেকটা সময় (প্রায় 24 ঘণ্টা) নেয়, তবে ইহা শক্ত দ্যুতিযুক্ত, টেকসই আস্তরণ সৃষ্টি করে।

স্পিরিট বার্ণিশ ঃ স্পিরিট বার্ণিশে সম্পূর্ণ উদ্বায়ী দ্রাবক যেমন, অ্যালকোহল বা ইথার ব্যবহার করা হয়। এই বার্ণিশ খুব দ্রুত শুষ্ক হয় এবং উৎপন্ন আস্তরণটি ভঙ্গুর হয়, ফলে ইহা সহজেই আবহাওয়া দ্বারা আক্রান্ত হয় ও ফেটে যায়।

বার্ণিশ কাঠের আসবাবপত্রের উপর সরাসরি বা পেন্ট করার পর উহার ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধি করার জন্য ব্যবহার করা হয়।

একটি ভাল বার্ণিশের নিম্নলিখিত বৈশিষ্ট্যগুলি থাকা প্রয়োজন ঃ

বার্ণিশ প্রয়োগের পর

(ক) তলের উপর ইহার দ্রুত ছড়িয়ে পড়া ও শুকিয়ে যাওয়া উচিত

(খ) তলের উপর নরম, স্থায়ী, স্থিতিস্থাপক আবরণ সৃষ্টি হওয়া উচিত

(গ) উজ্জ্বল, দ্যুতিময় আবরণ গঠিত হওয়া উচিত এবং আবহাওয়ার সংস্পর্শেও যেন রং হাল্কা বা পরিবর্তিত না হয়।

(ঘ) রঙ যেন কুঁচকে বা ফেটে না যায় অর্থাৎ উষ্ণতা পরিবর্তনে তলের সংকোচন বা প্রসারণের সঙ্গে আবরণটিও যেন সমভাবে সঙ্কুচিত বা প্রসারিত হয়।

8.10 ল্যাকার ও এনামেল

এগুলি স্পিরিট বার্ণিশ গ্রুপের মধ্যে পড়ে। স্পিরিট বার্ণিশ যেমন স্বচ্ছ ল্যাকার হল অস্বচ্ছ বা রঙীন। ল্যাকারের মধ্যে সেলুলোজ রেজিন (যেমন নাইট্রোসেলুলোজ, সেলুলোজ অ্যাসিটেট, ইথাইল সেলুলোজ), প্লাস্টিসাইজার, দ্রাবক ও রঙ করার পদার্থ থাকে।

এনামেলের মধ্যে অ্যালকিড রেজিন বা রঙযুক্ত বার্ণিশ থাকে। অ্যালকিড এনামেল কাঠের ভিতরের দিকে রঙ করার জন্য বেশী উপযোগী।

8.11 রঙ লাগাবার পদ্ধতিসমূহ

(i) বুরুশ দিয়ে

(ii) স্প্রে করে

(iii) ডুবিয়ে

(iv) টাম্ভলিং (tumbling) পদ্ধিতে

স্প্রে করে রঙ করলে উপরিতল খুব মসৃণ হয় কিন্তু রঙ বেশী খরচ হয়। পরিবেশ দূষিত করে। ডুবিয়ে রঙ করলে উপরিতল অমসৃণ ও উঁচু-নীচু হয়। টাম্বলিং পদ্ধতিতে সাধারণতঃ ক্ষুদ্র কাঠের দ্রব্যাদি রঙ করতে ব্যবহৃত হয়। একটি পিপেতে (barrel) রঙ ও ক্ষুদ্র বস্তুগুলি নিয়ে পিপেটি ঘোরানো হয়। ফলে ক্ষুদ্র বস্তুগুলির উপরিতলে রঙের আস্তরণ সৃষ্টি হয়। বস্তুগুলি ট্রেতে শুষ্ক করা হয়।

8.12 পেন্ট ও বার্ণিশের মধ্যে পার্থক্য

উপাদান	ভূমিকা
1. ইহা শুষ্ককারী তেলে পিগমেন্টের প্রলম্বন।	1. ইহা শুষ্ককারী তেলে রেজিনের কলয়ডীয় দ্রবণ।
2. তলের উপরে প্রযুক্ত পেন্ট ধীরে ধীরে জারিত হয় ও রঞ্জকযুক্ত আস্তরণ সৃষ্টি করে।	2. তলের উপর প্রয়োগ করলে জারণ ও পলিমার গঠনের মাধ্যমে স্বচ্ছ ও উজ্জ্বল আস্তরণ গঠন করে।
3. পেন্ট দ্বারা কোন তলকে যে কোন ইচ্ছামত রং-এ রঞ্জিত করা যায়।	3. ইহা দ্বারা তলকে ইচ্ছামত রং-এ রঙীন করা যায় না, ইহা শুধু তলের ঔজ্জ্বল্য বৃদ্ধি করে।
4. পেন্ট-প্রযুক্ত তলকে আরও উজ্জ্বল করার জন্য উহার উপর বার্ণিশ করা চলে।	4. বার্ণিশ করা তলে আর পেন্টের প্রয়োগ চলে না।
5. পেন্ট কাঠ ও ধাতু উভয় জাতীয় দ্রব্যের উপর প্রয়োগ করা যায় কারণ ইহা উভয়কেই আবহাওয়ার আক্রমণজনিত ক্ষয় থেকে রক্ষা করে।	5. বস্তুকে আবহাওয়ার আক্রমণ থেকে বিশেষ রক্ষা করতে পারে না, সে কারণে গৃহের অভ্যন্তরে শুধু কাঠের আসবাবপত্রের উপর ইহার প্রলেপ দেওয়া হয়।
6. কাঠের সূক্ষ্ম আঁশকে ফুটিয়ে তুলতে পারে না, কাঠকে সম্পূর্ণভাবে ঢেকে ফেলে।	6. ইহা কাঠের সূক্ষ্ম আঁশকে সুন্দরভাবে ফুটিয়ে তোলে।

8.13 ভারতের কয়েকটি প্রধান রঙ উৎপাদক সংস্থার নাম

1. Asian Paints, Ltd., Bombay
2. Bombay Paints and Allied Products Ltd., Bombay

3. Blundell Ecomite Paints Ltd., Bombay
4. Jenson and Nicholson (India) Ltd., Naihati
5. Goodlass Nerolac Paints (Pvt.) Ltd., Bombay
6. Shalimar Paint, Colour and Varnish Co. Ltd., Howrah
7. Sigma Paints Ltd., Bombay.

8.14 সারাংশ

এই এককটি পাঠ করে রঙ শিল্প ও বার্ণিশ সম্ভবন্ধে আপনার কিছু ধারণা জন্মেছে। এককের সার-সংক্ষেপে তা উল্লেখ করা হল।

- রঙের সংজ্ঞা ও রঙের উপাদান
- রঞ্জক পদার্থগুলি অজৈব ও জৈব দুরকমই হতে পারে
- রঞ্জক পদার্থের বৈশিষ্ট্যগুলি কি কি; রঙের ধর্ম যেমন, জলবায়ুর আক্রমণ প্রতিহত করা, ধাতুর ক্ষয় প্রতিরোধ করার ক্ষমতা ইত্যাদি
- বিস্তারক, থিনার, ড্রায়ার, প্লাস্টিসাইজার ও রেজিন ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা কী এবং এসব প্রস্তুত করতে কোন্ কোন্ জৈব যৌগ ব্যবহার করা হয়
- রঙের উৎপাদন পদ্ধতির বর্ণনা
- ইমালশান রঙ ও তরুক্ষীর রঙ বলতে কী বোঝায় এবং এদের দোষ গুণ
- বিভিন্ন রঙের পিগমেন্টের ব্যবাহর—যেমন, জিঙ্ক হোয়াইট (সাদা), আয়রন অক্সাইড (লাল), ক্রোমিয়াম অক্সাইড (সবুজ) ইত্যাদি।
- তেল বার্ণিশ ও স্পিরিট বার্ণিশের বৈশিষ্ট্য
- রঙ লাগাবার বিভিন্ন পদ্ধতি
- ভারতের বিশেষ করে পশ্চিমবাংলার কয়েকটি প্রধান রঙ উৎপাদক সংস্থার নাম

8.15 সর্বশেষ প্রশ্নাবলি

1. এক কথায় উত্তর দিন :
   (a) রঙের প্রধান উপাদান কী?
   (b) বার্ণিশের প্রধান উপাদান কী?
   (c) একটি ধাতব পিগমেন্টের উদাহরণ দিন।

(d) একটি কৃত্রিম রেজিনের নাম উল্লেখ করুন।

(e) একটি ড্রায়ারের নাম লিখুন।

(f) একটি থিনারের উদাহরণ দিন।

2. সংক্ষিপ্ত উত্তর রচনা করুন :

(a) রঙ ব্যবহারের প্রয়োজনীয়তা কী?

(b) রঙের প্রয়োজনীয় উপাদান কী কী?

(c) রঞ্জক পদার্থের বৈশিষ্ট্যগুলি লিখুন।

(d) রঙের আবশ্যিক ধর্ম উল্লেখ করুন।

(e) ইমালশাল রঙ কাকে বলে?

(f) ইমালশান রঙের দোষ-গুণগুলি উল্লেখ করুন।

(g) তরুক্ষীর রঙ কী?

(h) তরুক্ষীর রঙের সুবিধা এবং অসুবিধাগুলি উল্লেখ করুন।

(i) তেল বার্ণিশ এবং স্পিরিট বার্ণিশ বলতে কি বোঝেন?

(j) বার্ণিশে ব্যবহৃত কতকগুলি তেলের নাম করুন।

(k) ল্যাকার ও এনামেল কী?

(l) রঙ লাগাবার পদ্ধতিগুলি উল্লেখসহ বর্ণনা করুন।

(m) পেন্ট ও বার্ণিশের মধ্যে কয়েকটি পার্থক্য উল্লেখ করুন।

(n) পশ্চিমবঙ্গসহ ভারতের কয়েকটি প্রধান রঙ উৎপাদক সংস্থার নাম উল্লেখ করুন।

8.16 উত্তরমালা

1. (a) পিগমেন্ট

(b) রেজিন

(c) অ্যালুমিনিয়াম

(d) ফেনল ফরম্যালডিহাইড

(e) ম্যাঙ্গানিজ-লিনোলিয়েট

(f) তার্পিন

2. (a) প্রস্তাবনা দেখুন।

(b) 8.1 দেখুন।

(c) 8.2 দেখুন।

(d) 8.3 দেখুন।

(e) 8.6 দেখুন।

(f) 8.6.1 দেখুন।

(g) 8.7 দেখুন।

(h) 8.7 দেখুন।

(i) 8.9 দেখুন।

(j) তিসির তেল, সয়াবিন তেল, অনার্দ্র ক্যাস্টর তেল ইত্যাদি।

(k) 8.10 দেখুন।

(l) 8.11 দেখুন।

(m) 8.12 দেখুন।

(n) 8.13 দেখুন।

NOTES

NOTES

NOTES